অধ্যায় ১০ মানবদেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)
DEFENCE OF HUMAN BODY (IMMUNITY)

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ ও তন্ত্র পরিবেশীয় কিছু প্রভাবকের বিরুদ্ধে সর্বদা 'যুদ্ধরত অবস্থায়' (in war) থাকে। কেননা পরিবেশীয় এসব প্রভাবক মানুষের দেহে নানাভাবে প্রবেশ করে এবং মানুষের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে কখনো কখনো বিপর্যস্ত করে তোলে বা তোলার চেষ্টা করে। এসব প্রভাবকের মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, পরজীবী এবং বিষ উল্লেখযোগ্য। এসব আক্রমণকারীকে সংক্রমক বা প্যাথোজেন (pathogen) বলে। এসব প্যাথোজেনের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও পানির একটি সমৃদ্ধ উৎস হলো মানবদেহ। কীভাবে মানবদেহ এসব সংক্রমকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ইমিউনোলজি
- সাইটোকাইনস
- ফ্যাগোসাইটস
- সহজাত অনাক্রম্যতা
- অর্জিত অনাক্রম্যতা
- অ্যান্টিবডি
- অপসোনিন
- মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি
- অ্যান্টিজেন
- টিকা
- মেমোরি কোষ

পিরিয়ড সংখ্যা ৯। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১। মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২। মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে ত্বকের কাজ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩। খ্যাদ্য দ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরিপাকনালির অ্যাসিড ও এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪। ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলস এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫। মানবদেহের সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬। মানবদেহের প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭। মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৯। দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা তৈরিতে মেমোরি কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ● প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ○ প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা ○ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির অ্যাসিড ও এনজাইমের ভূমিকা ● দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ○ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে নিউট্রোফিলস ● তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ সহজাত ○ অর্জিত ● প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা ● প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা ● দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতি কোষের ভূমিকা

১০.১. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা (Concept of human defence system)

বিভিন্ন ধরনের সংক্রমক নাসিকা ছিদ্র, মুখছিদ্র, ত্বকের বিচ্ছিন্ন অংশ, জননছিদ্র ইত্যাদির মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। এরা বিভিন্ন কলায় বাস করে বা বংশবৃদ্ধি করে অথবা বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। এরা মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন করে। এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানবদেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিস্ময়করভাবে অধিকাংশ সময়ই আমরা সুস্থ থাকি। মানবদেহ একটি অনুপম ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব ক্ষতিকর সংক্রমকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে সুরক্ষা লাভ করে। একে মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (human

CamScanner

defence system) বা অনাক্রম্যতন্ত্র (immune system) বলে। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি (Immunology) বলে। অনাক্রম্য (immunity) শব্দটি অনেকসময় প্রতিরোধ (resistance) শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইংরেজ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner) 1796 সালে গুটি বসন্তের (small pox) টিকা আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি সম্পর্কে ধারণা দেন। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) প্রমাণ করেন যে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আক্রান্ত দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেহের নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে কাজ করে যা বিভিন্ন জীবাণু বা পরজীবী এবং বিষ বা প্রতিবিষের আক্রমণ থেকে দেহকে সুরক্ষা প্রদান করে।

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত দুধরনের হয়, যথা-

১। সাধারণ বা নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (General or non-specific defence system): এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেহে যে কোনো ধরনের সংক্রমণকারীকে প্রবেশে বাধা দেয় অথবা ইতোমধ্যে দেহে প্রবেশকৃত জীবাণুকে হত্যা বা ধ্বংস করে। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সহজাত বা জন্মগত অনাক্রম্য ব্যবস্থা (innate immunity or in-born immunity) বলা হয়। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সকল ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীতে বিদ্যমান থাকে এবং যে কোনো সংক্রমণের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

২। সুনির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Specific defence system): এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট জীবাণুকে অ্যান্টিবডি উৎপাদন দ্বারা হত্যা করে কিংবা শ্বেত রক্ত কণিকা (WBC) দ্বারা ভক্ষণ করে। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দেহের অভিযোজিত বা অর্জিত অনাক্রম্য ব্যবস্থা (adaptive or acquired immunity) বলা হয়।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্তর

সাধারণ বা নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মানবদেহের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর এবং সুনির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর গঠন করে।

নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (সহজাত অনাক্রম্যতা)		স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (অর্জিত অনাক্রম্যতা)
প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর	দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর	তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
১। ত্বক	১। ফ্যাগোসাইটস	
২। লোম	২। ন্যাচারাল কিলার কোষ	
৩। সিলিয়া	৩। কম্প্লিমেন্ট তন্ত্র	১। লিম্ফোসাইটস
৪। কানের মোম	৪। সাইটোকাইনস	২। অ্যান্টিবডি
৫। অশ্রু, শ্লেষ্মা ও লালা	৫। ইন্টারফেরন	৩। স্মৃতিকোষ
৬। পাকস্থলির অ্যাসিড ও এনজাইম	৬। অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন	
৭। রেচন ও জনন অঙ্গের অ্যাসিড	৭। প্রদাহ	
৮। মাইক্রোবায়োম	৮। জ্বর	
৯। মলত্যাগ ও বমি	৯। রক্ত তঞ্জন	

প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বা বহিস্তলীয় প্রতিবন্ধক (First line defence or surface barriers)

সহজাত অনাক্রম্যতার যে সব উপাদান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে তাদের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বা বহিস্তলীয় প্রতিবন্ধক বলে। রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবগুলো প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর দ্বারাই প্রথম বাধা প্রাপ্ত হয়। কোনো কারণে মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ভেঙ্গে গেলে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর সক্রিয় হয়। মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদানসমূহ হলো:

CamScanner

১। ত্বক (Skin): ত্বক দেহের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে এবং দেহে সংক্রমক প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। ত্বকীয় ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত ঘাম এবং সিবেসিয়াস গ্রন্থি নিঃসৃত তৈল (সিবাম) ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিষ স্বরূপ। ত্বকে বিদ্যমান মিথোজীবী অণুজীব সংক্রমক অণুজীব প্রতিরোধ করে। ত্বকে হায়ালোরনিক অ্যাসিড (hyaluronic acid) থাকার কারণে উহা অণুজীবদের জন্য অতি অম্লীয় (pH=5-6) হয় যা এদেরকে ধ্বংস করে।

২। লোম (Hair): নাকের ভেতরে বিদ্যমান লোম প্রশ্বাস বাতাস থেকে অণুজীব, ধূলিকণা ও অন্যান্য দূষক পদার্থ ছেঁকে রাখে এবং এদের দেহে প্রবেশ রোধ করে।

৩। সিলিয়া ও মিউকাস (Cilia and mucus): শ্বাসনালিতে বিদ্যমান সিলিয়া ও মিউকাস অবিরাম ধূলিকণা ও অণুজীবদের হাঁচি (sneezing) ও কাশির (coughing) মাধ্যমে বের করে দেয়।

৪। অশ্রু, মিউকাস ও লালা (Tears, mucus and saliva): অশ্রু, মিউকাস ও লালায় যথাক্রমে লাইসোজাইম এনজাইম, ফসফোলাইপেজ A এবং হিস্টাটিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেগুলো অনেক ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর ভেঙ্গে এগুলোকে ধ্বংস করে। এসব পদার্থ দ্বারা যেসব অণুজীব মরে না সেগুলো মিউকাসে আবদ্ধ হয়ে গলাধঃকরণ হয়। আমাদের নাক, গলা, পৌষ্টিকনালি ও ফুসফুসের অন্তঃপ্রাচীরের বিশেষ আবরণী কোষ মিউকাস উৎপাদন করে যাতে আক্রমণকারী অণুজীব আটকে যায়।

৫। সিরুমেন (Cerumen): সিরুমেন বা কানের খৈল (earwax) এক ধরনের বাদামি, ধূসর বা হলুদাভ মোম জাতীয় পদার্থ যা মানুষের কর্ণকূহরের প্রাচীরের সেরুমিনাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এটি কর্ণকূহরের ত্বককে পরিষ্কার ও সিক্ত রাখে এবং ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, পতঙ্গ ও পানি থেকে রক্ষা করে।

৬। পাকস্থলির অ্যাসিড ও এনজাইম (Stomach acid and enzymes): পাকস্থলিতে বিদ্যমান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও প্রোটিওলাইটিক অ্যাসিড খাদ্যের সাথে আগত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে।

৭। রেচন-জননতন্ত্রের অ্যাসিড (Urinogenital acid): যোনিতে বিদ্যমান মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া (*Lactobacillus* sp.) ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে অন্যান্য অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করে। দ্রুত গতিতে প্রবাহিত মূত্রের মাধ্যমে অনেক অণুজীব মূত্রনালি হতে বের হয়ে যায়।

৮। মাইক্রোবায়োম (Microbiome): দেহের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বন্ধু অণুজীব রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবদের সাথে পুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা করে। এতে অনেকসময় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৯। মলত্যাগ ও বমি (Defecation and vomiting): মলত্যাগ ও বমির মাধ্যমে অসংখ্য ক্ষতিকর অণুজীব দেহ হতে বহিষ্কৃত হয়।

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Second line defence)

দেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর নন-স্পেসিফিক বা সহজাত ধরনের অনাক্রম্য ব্যবস্থা। মানবদেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদানসমূহ হলো:

১। ফ্যাগোসাইটস (Phagocytes): শ্বেতরক্ত কণিকা (WBC) অণুজীব ভক্ষণ করে ফ্যাগোসাইটস হিসেবে কাজ করে। এরা সংক্রমিত স্থানে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণ করে মারা যায় এবং পুজ (pus) সৃষ্টি করে। মানবদেহের প্রায় 50 বিলিয়ন শ্বেত রক্তকণিকা প্রতিনিয়ত জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়ছে। কোনো কোনো ফ্যাগোসাইটস ক্ষুদ্রাকৃতির, এদের মাইক্রোফেজ (microphages) বলে। এরা অল্প দিন বাঁচে। কোনো কোনো ফ্যাগোসাইটস বৃহদাকৃতির, এদের ম্যাক্রোফেজ (macrophages) বলে। এরা দীর্ঘদিন বাঁচে। অধিকাংশ ম্যাক্রোফেজ রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিবাহিত হয়ে জীবাণু ভক্ষণ করে। এদের অনেকে প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, টনসিল, অ্যাডিনয়েড ও অ্যাপেনডিক্সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং লসিকায় বিদ্যমান জীবাণু ধ্বংস করে।

২। প্রাকৃতিক মারণকোষ (Natural Killer cells=NK cells): দেহের সহজাত অনাক্রম্যতায় বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা, প্রাকৃতিক মারণকোষ বা NK cells গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাইরাস আক্রান্ত কোষ ও

CamScanner

টিউমার কোষকে ধ্বংস করার জন্য এসব কোষ বিশেষায়িত। প্রাকৃতিক মারণকোষ থেকে সাইটোটক্সিন, পারফোরিন এবং গ্রানজাইম নিঃসৃত হয় সুনির্দিষ্ট কোষের আবরণীতে ছিদ্র সৃষ্টি করে। সুনির্দিষ্ট কোষের আবরণীর এসব ছিদ্র দিয়ে পানি প্রবেশ করে উহা স্ফীত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। প্রাকৃতিক মারণকোষসমূহের এরূপ আক্রমণের কারণ হলো এরা কোষে বাছ-বিচারহীনভাবে ভাইরাস ধ্বংস করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

৩। কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র (The complement system): কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র হলো মানবদেহের অনাক্রম্যতন্ত্রে বিদ্যমান জৈবরাসায়নিক পদার্থের সমাহার যা দেহ হতে সংক্রমক নির্মূল করে এবং ক্ষয়পূরণ ত্বরান্বিত করে। মানব অনাক্রম্যতন্ত্রের কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র 20টি প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত যা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে। যকৃত কর্তৃক উৎপাদিত হয়ে এ প্রোটিনগুলো রক্তরসে ঘুরে বেড়ায়। প্লাজমা প্রোটিনের প্রায় 10% কমপ্লিমেন্ট তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। অনাক্রম্যতায় সাড়া জাগানোর জন্য এতন্ত্র বিশেষভাবে কাজ করে। তবে এদের ক্রিয়া নন-স্পেসিফিক ধরনের।

যেসব ক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র কাজ করে সেগুলো হলো:

- অপসোনাইজেশন: ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক অ্যান্টিজেনের ফ্যাগোসাইটোসিস ক্রিয়া বৃদ্ধি করে।
- কেমোট্যাক্সিস: ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলকে আকর্ষণ করে।
- সেল লাইসিস: ভাইরাস, জীবাণু বা অণুজীবকে সরাসরি বিদীর্ণ করে।
- ক্ল্যাম্পিং: পেপটাইড উৎপাদনের মাধ্যমে প্রদাহ ক্রিয়া ও অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া নিয়ন্ত্রণ।

৪। সাইটোকাইনস (Cytokines): অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দিয়ে অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষসমূহ যেসব বিশেষ ধরনের প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সাইটোকাইনস বলে। ইন্টারলিউকাইন (interleukins), ইন্টারফেরন (interferons), গ্রোথ ফ্যাক্টর (growth factors) প্রভৃতি প্রধান ধরনের সাইটোকাইন। এরা অনাক্রম্যতন্ত্রে প্রধান তিন উপায়ে কাজ করে–

- কেমোট্যাক্সিস এবং প্রদাহের মাধ্যমে সহজাত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- লিম্ফোসাইট সক্রিয়করণের মাধ্যমে অর্জিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- নতুন শ্বেত রক্ত কণিকা উৎপাদনের মাধ্যমে হেমাটোপোয়েসিস প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে।

৫। ইন্টারফেরন (Interferon): ইন্টারফেরন হলো উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট গ্লাইকোপ্রোটিন যা ভাইরাস আক্রান্ত কোষ কর্তৃক নিঃসৃত হয়ে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই মানবদেহের অধিকাংশ কোষ ইন্টারফেরন উৎপন্ন করে। ইন্টারফেরন বিশেষ ধরনের সাইটোকাইন যা সুনির্দিষ্টভাবে ভাইরাস ও টিউমার কোষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভাইরাস আক্রান্ত কোষগুলো ইন্টারফেরন নিঃসরণ করে আশেপাশের কোষগুলোকে ভাইরাসের প্রতি সংবেদনশীলতা কমানোর জন্য সতর্ক করে দেয়। এছাড়া ইন্টারফেরন আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য কিছু প্রাকৃতিক মারণকোষ (NK cells) নিয়োগ করে। অ্যালেক ইস্যাকস ও জ্যাঁ লিনডেনম্যান (Alec Issacs and Jean Lindenmann) 1957 সালে সর্বপ্রথম মানবদেহে ভাইরাস প্রতিরোধী যৌগ ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন।

৬। অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন (Acute phase proteins-APPs): অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন হলো রাসায়নিক ও কাজের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির কতগুলো প্রোটিন। মানবদেহে কলার জখম, চরম সংক্রমণ, পোড়া বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারণে রক্তের প্লাজমায় এদের ঘনত্বের ব্যাপক পরিবর্তন হয় অর্থাৎ বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়।

৭। প্রদাহ (Inflammation): যখন কোনো কোষ অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তারা হিস্টামিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে যা কৈশিকনালিকায় অসংখ্য ছিদ্রের সৃষ্টি করে। এতে দেহের সংক্রমিত স্থান লাল হয়ে ফুলে যায় এবং তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ব্যথা অনুভূত হয়। এ অবস্থাকে প্রদাহ (inflammation) বলে। দেহের কোনো স্থানে প্রদাহ সৃষ্টি হলে বিভিন্ন স্থান থেকে ফ্যাগোসাইটস (WBC) দ্রুত ঐ স্থানে পৌছায় এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে

CamScanner

প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জ্বর আসা কিংবা প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া মানে হলো দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র ভালোভাবে কাজ করার লক্ষণ।

৮। জ্বর (Fever): কোনো সংক্রমণের কারণে দেহের তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিকের চেয়ে (স্বাভাবিক তাপমাত্রা: 98.6° F বা 37°C) বেড়ে যায় তখন তাকে জ্বর বলে। দেহকোষ থেকে ক্ষরিত হরমোন প্রকৃতির প্রোস্টাগ্লান্ডিন (prostaglandins) নামক লিপিড যৌগের উদ্দীপনায় মানবদেহে জ্বর সৃষ্টি হয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে দেহের তাপমাত্রা 100.4°F বা 38°C এর উপরে না উঠা পর্যন্ত জ্বরকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ওষুধ কিংবা বিষের ন্যায় কোনো বাহ্যিক আক্রমণকারীর প্রতি দেহের অনাম্যতন্ত্রের সাড়াদানের কারণে জ্বর অনুভূত হয়। সংক্রমণকারীর এনজাইম বা বিষকে নিষ্ক্রিয় করে এদের বৃদ্ধি রহিত করার মাধ্যমে জ্বর বিভিন্ন সংক্রমণের মোকাবেলা করে। জ্বর কোষের বিপাকীয় কার্যাবলি বৃদ্ধি এবং তাপ সহিষ্ণু প্রোটিনের সক্রিয়করণের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক অনাক্রম্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালি করে তোলে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জ্বর দেহের জন্য উপাকারি হলেও সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত জ্বর দেহের নিজস্ব এনজাইম ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়।

৯। রক্ত তঞ্চন (Blood clotting): ক্ষতস্থানের বিচ্ছিন্ন রক্তনালি হতে রক্তপাত বন্ধের প্রক্রিয়াকে রক্ত তঞ্চন বলে। ক্ষতস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষ ও রক্তের অণুচক্রিকা থেকে ক্ষরিত রাসায়নিক সংকেত বা তঞ্চন ফ্যাক্টরের উদ্দীপনায় রক্ততঞ্চন সংঘটিত হয়। ক্ষতস্থানে দ্রুত রক্ত তঞ্চন ঘটে দেহে অণুজীব প্রবেশ রোধ করে।

তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third line defence)

অর্জিত বা সুনির্দিষ্ট অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান মানবদেহের তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে গণ্য। সাধারণত মানুষ যখন কোনো জীবাণু বা পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন দেহের ভেতর সুনির্দিষ্ট অনাক্রম্য সাড়া জাগে। এ প্রক্রিয়ায় বিশেষ কোষীয় সহযোগিতায় অথবা অ্যান্টিবডি নামক পদার্থ সৃষ্টি করে দেহ জীবাণু বা পরজীবীকে ধ্বংস করে। পরজীবীদের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধমূলক সাড়া জেগে উঠার কারণ হলো পরজীবী কর্তৃক নিঃসৃত কোনো বিষাক্ত পদার্থ বা পরজীবীর দেহ গঠনের বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক উপাদান। দেহের ভেতর বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে যখন পরজীবী কিংবা বিষাক্ত পদার্থ বহিরাগত (foreign) বলে চিহ্নিত হয় তখনই অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জেগে উঠে।

অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া প্রদান মানবদেহকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিরক্ষা প্রদান করতে পারে। মানবদেহের শারীরবৃত্তীয় কিছু ক্ষমতা আছে যা দেহের প্রতিটি কোষ বা কোষ উৎপাদিত কোনো প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে চিনে নিতে পারে। দেহের বাইরে থেকে যখন কোনো অণুজীব বা পরজীবী কিংবা এদের উৎপাদিত কোনো প্রোটিন পদার্থ দেহে প্রবেশ করে তখন সাথে সাথে দেহ এ অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশকে শনাক্ত করে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। মানবদেহের এ ক্ষমতাকে **অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি** (immunity) বলে। সহজ কথায় **মানবদেহের পরজীবীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি বলে।** কতগুলো কোষ এবং অঙ্গ মিলে মানবদেহে অনাক্রম্য ব্যবস্থার (immune system) এমন একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে যা বাইরের যে কোনো আক্রমণকারীর (invader) বিরুদ্ধে সম্বিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মানবদেহের অনাক্রম্যতা একটি জটিল ও বিস্ময়কর পদ্ধতি। এর কোনোরকম বিঘ্নতায় দেহে সৃষ্টি হয় অ্যালার্জি, আর্থ্রাইটিস, ক্যানসার কিংবা এইডসের মতো জটিল রোগ।

অনাক্রম্য ব্যবস্থার উপাদান

(Components of immune system)

মানবদেহের প্রায় সর্বত্রই অনাক্রম্য ব্যবস্থার অঙ্গসমূহ বিদ্যমান। যে সব অঙ্গ মানবদেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থার সাথে জড়িত তাদেরকে লিম্ফয়েড অঙ্গ (lymphoid organs) বলে, কারণ এগুলো লিম্ফোসাইটস (lymphocytes) নামক ক্ষুদ্র শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদন ও সঞ্চয় করে যারা অনাক্রম্য ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা পালন করে।

রক্তনালি এবং লসিকানালি দেহের বিভিন্ন স্থানে লিম্ফোসাইটস পরিবহন করে লিম্ফয়েড অঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে। মানবদেহের লিম্ফয়েড অঙ্গগুলো হলো:

CamScanner

১। অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি (Adenoids): নাসিকা নালির পেছনে অবস্থিত দুটি গ্রন্থি।

২। অ্যাপেনডিক্স (Appendix): বৃহদান্ত্রের সাথে যুক্ত নলাকার গঠন বিশেষ।

৩। রক্তনালি সমূহ (Blood vessels): দেহের সর্বত্র বিস্তৃত শিরা, ধমনি ও কৈশিক জালিকাসমূহ।

৪। অস্থিমজ্জা (Bone marrow): অস্থি গহ্বরে অবস্থিত নরম ও চর্বিযুক্ত কলা। লোহিত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা সৃষ্টির পাশপাশি অস্থিমজ্জা B-কোষ, প্রাকৃতিক মারণকোষ, গ্রানুলোসাইট ও অপরিপক্ক থায়মোসাইট উৎপাদন করে।

৫। লসিকা গ্রন্থি (Lymph nodes): দেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট সিম আকৃতির গ্রন্থি যেগুলো লসিকানালি দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এদের অধিকাংশই T-কোষ, B কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ ও ম্যাক্রোফেজ নিয়ে গঠিত।

৬। লসিকা নালি (Lymphatic vessels): দেহের সর্বত্র বিস্তৃত নালিকা যেগুলো লসিকা পরিবহন করে।

৭। পেয়ার প্যাচ (Peyer's patches): ক্ষুদ্রান্ত্রে বিদ্যমান লসিকা কলা।

৮। থাইমাস (Thymus): শ্বাসনালির পেছনে অবস্থিত গ্রন্থি। থাইমাস T-কোষ উৎপাদন করে।

৯। প্লীহা (Spleen): এটি উদর গহ্বরে বিদ্যমান মুষ্টি আকারের গঠন বিশেষ। একে রক্তের 'ইমিউনোলজিক্যাল ফিল্টার' বলে। এতে অসংখ্য লোহিত রক্ত কণিকা, T-কোষ, B কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ, NK কোষ ও ম্যাক্রোফেজ থাকে।

১০। টনসিল (Tonsils): গ্রীবার পেছনে অবস্থিত দুটি ডিম্বাকার গঠন বিশেষ।

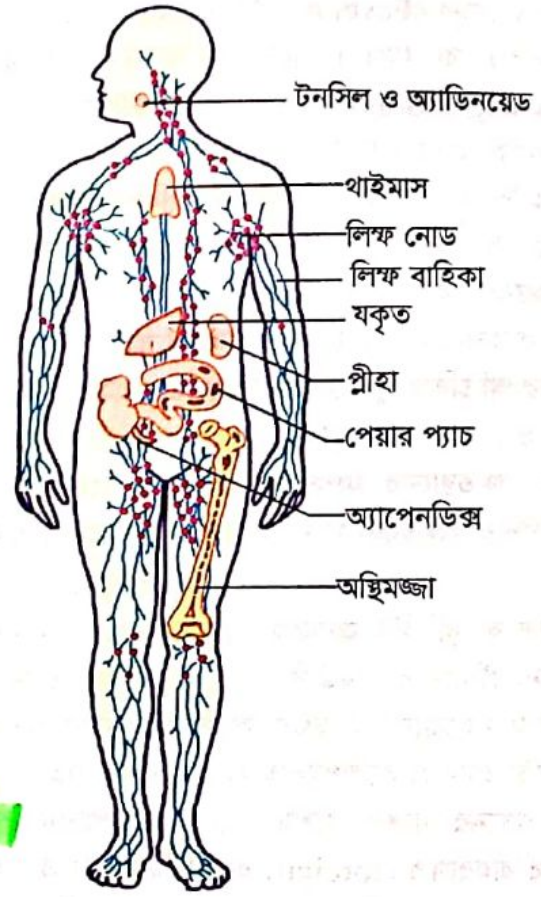

চিত্র ১০.১ মানবদেহের বিভিন্ন লিম্ফয়েড অঙ্গ

অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষ এবং এদের উৎপাদ (Immune cells and their products)

মানব অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কোষসমূহ হলো লিউকোসাইট, ফ্যাগোসাইট এবং এদের সমগোত্রীয় কিছু কোষ। কোনো কোনো অনাক্রম্য কোষ সকল ধরণের বহিরাগত অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে আবার কিছু কোষ সুনির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করে। কিছু কোষ সরাসরি বহিরাগতের সংস্পর্শে আসে আবার কিছু কোষ রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সৃষ্টির জন্য অনাক্রম্যতন্ত্রে কিছু প্রতিরক্ষাকারী কোষের মজুত থাকে। যখনই কোনো অ্যান্টিজেনের আগমন ঘটে তখন ঐসব মজুত কোষসমূহ দ্রুত বিভাজিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কার্যসম্পাদনের পর এরা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। নিম্নে মানব অনাক্রম্যতন্ত্রের বিভিন্ন কোষের বিবরণ দেয়া হলো:

১। লিম্ফোসাইট (Lymphocytes): লিম্ফোসাইট এক ধরনের শ্বেত রক্ত কণিকা। এগুলো অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কোষ। লিম্ফোসাইট প্রধানত তিন ধরনের হয়ে থাকে, যথা- B লিম্ফোসাইট, T লিম্ফোসাইট এবং প্রাকৃতিক মারণ কোষ।

(ক) B লিম্ফোসাইট (B lymphocytes or B cells): এগুলো প্রধানত অ্যান্টিবডি (antibody) নিঃসরণকারী কোষ। অ্যান্টিবডি রক্তে প্রবাহিত অ্যান্টিজেনকে ঘিরে ফেলে এবং ধ্বংস করে। প্রতিটি B লিম্ফোসাইট সুনির্দিষ্ট

অ্যান্টিবডি উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত থাকে। যখন কোনো B লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয় তখন এটি আকারে অনেক বড় হয়ে যায়। এ অবস্থায় একে প্লাজমা কোষ (plasma cell) বলে। প্রকৃতপক্ষে একটি প্লাজমা কোষ অ্যান্টিবডি উৎপাদনের কারখানা হিসেবে কাজ করে। একটি প্লাজমা কোষ থেকে লক্ষ লক্ষ অভিন্ন অ্যান্টিবডি উৎপাদিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়।

(খ) T লিম্ফোসাইট (T lymphocytes or T cells): T লিম্ফোসাইট অনাক্রম্যতন্ত্রে দুভাবে কাজ করে। এদের কিছুসংখ্যক অনাক্রম্য সাড়াদান নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যগুলোকে মারণ কোষ (killer cells) বলে কারণ এরা দেহের সংক্রমিত কিংবা ক্যানসার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে। T লিম্ফোসাইট থেকে সাইটোকাইন বা লিম্ফোকাইন (cytokine or lymphokine) নামক এক ধরনের শক্তিশালি রাসায়নিক বার্তাবাহক পদার্থ নিঃসৃত হয় যা নির্দিষ্ট কোষ বা পদার্থকে গতিশীল করে। এছাড়া এরা কোষের বৃদ্ধি, সক্রিয়করণ, গতিপথ নির্ধারণ, লক্ষিত কোষের ধ্বংস ও ফ্যাগোসাইটিক কার্যাবলিকে উদ্দীপ্ত করে। Helper T cells বিশেষ ধরনের T লিম্ফোসাইট যাদের বহিঃতলে CD4+ নামক অনন্য ধরনের অ্যান্টিজেন থাকে।

(গ) প্রাকৃতিক মারণকোষ (Natural killer cells orNK cells): এগুলো বিশেষ ধরণের মারণ লিম্ফোসাইট। এদের গঠন T কোষের মতোই তবে এরা যে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করে।

২। ফ্যাগোসাইটস (Phagocytes): ফ্যাগোসাইটস বা ভক্ষণকারী কোষ বৃহদাকৃতির শ্বেতকণিকা যারা অণুজীব এবং বহিরাগত অণুকে ভক্ষণ করতে সক্ষম। যেসব ফ্যাগোসাইটস রক্তে পরিভ্রমণ করে তাদের মনোসাইটস (monocytes) বলে। যখন মনোসাইটগুলো কলায় চলে আসে তখন এরা আকারে বড় হয় এবং এদের ম্যাক্রোফেজ বা বৃহৎ খাদক (macrophages, or big eaters) বলে। ফুসফুস, বৃক্ক, মস্তিষ্ক ও যকৃতে বিশেষ ধরণের অসংখ্য ম্যাক্রোফেজ পাওয়া যায়। ম্যাক্রোফেজ অনাক্রম্যতন্ত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এরা দেহের মৃতকোষ, আঘাতপ্রাপ্ত কোষ এবং অন্যান্য ময়লা ভক্ষণ করে। এরা মনোকাইনস (monokines) নামক শক্তিশালি রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে যা অনাক্রম্যতায় সাড়াদানে প্রধান ভূমিকা রাখে।

কোনো কোনো ফ্যাগোসাইটের লাইসোসোমে বিদ্যমান এনজাইম রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন ইন্টারমেডিয়েট (ROIs) ও রিঅ্যাকটিভ নাইট্রোজেন ইন্টারমেডিয়েট (RNIs) নামক দুধরনের কোষবিষ (cytotoxin) উৎপাদন করে। এসব কোষবিষের ক্রিয়ায় দেহে প্রবেশকৃত অণুজীব বা পরজীবীকে ধ্বংস হয়ে যায়।

৩। গ্র্যানুলোসাইট (Granulocytes): এগুলো দানাদার গঠন বহনকারী বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা। এদের দানাদার গঠনে শক্তিশালি রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেগুলো অণুজীব ধ্বংস করে মানব অনাক্রম্য ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন, হিস্টামিন (histamine) দেহে প্রদাহ ও অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। তিন ধরনের গ্রানুলোসাইট দেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। এগুলো হলো নিউট্রোফিল (neutrophil), ইওসিনোফিল (eosinophils) ও বেসোফিল (basophils)। এরা সকলেই বিশেষ ধরনের শক্তিশালি রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করে। ফুসফুস, ত্বক, জিহ্বা, নাক ও অন্ত্রের অন্তঃআবরণ ইত্যাদিতে মাস্ট কোষ (mast cells) নামক বেসোফিলের মতো এক ধরনের কোষ থাকে যারা দেহে অ্যালার্জি (allergy) সৃষ্টির জন্য দায়ী।

৪। অণুচক্রিকা (Blood platelet): গ্র্যানুলোসাইট জাতীয় শ্বেত রক্তকণিকার মতো রক্তের অণুচক্রিকায় রাসায়নিক পদার্থযুক্ত দানা থাকে। এরা রক্ত তঞ্চনের পাশাপাশি অনাক্রম্যতন্ত্রের কিছু অংশকে সক্রিয় করে তোলে।

৫। ডেনড্রাইটিক কোষ (Dendritic cells): এ ধরনের কোষ অস্থিমজ্জাতে সৃষ্ট হয়ে প্লীহা, লসিকা গণ্ড ও থাইমাস গ্রন্থিতে বিদ্যমান থাকে। এছাড়া রক্ত ও অন্যান্য কলায় এ কোষ পাওয়া যায়। ডেনড্রাইটিক কোষের প্রকৃত কাজ সম্পর্কে এখনো বিজ্ঞানীগণ জানতে পারেননি। তবে ধারণা করা হয় এসব কোষ অ্যান্টিজেনকে ধরে বিভিন্ন লিম্ফয়েড অঙ্গে নিয়ে যায় যেখানে অনাক্রম্য সাড়াদান শুরু হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এসব কোষ CD4+ T কোষে রূপান্তরিত হয়ে বিপুল পরিমাণ HIV সাথে যুক্ত হয়ে এদের ধ্বংস করে।

১০.২.১ দেহের প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর)
(Role of skin in defence of the body-The first line of defence)

ত্বক মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ। একজন পরিণত মানুষের দেহে প্রায় ৪ পাউন্ড ওজনের ত্বক থাকে যা প্রায় 22 বর্গফুট এলাকাকে ঢেকে রাখে। বাইরের এপিডার্মিস এবং ভেতরের ডার্মিস স্তর নিয়ে ত্বক গঠিত। ত্বকের নিচে একটি পাতলা চর্বির স্তর থাকে। ত্বক ক্ষতিকর অণুজীব ও পরজীবীর আক্রমণ প্রতিরোধ, অন্তঃস্থ অঙ্গাদিকে সুরক্ষাসহ নানাবিদ গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত। মানবদেহের প্রতিরক্ষায় যেসব ক্ষেত্রে ত্বক ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো:

১। **অতি বেগুনি রশ্মি হতে সুরক্ষা** (Protection from UV Radiation): ত্বক দেহকে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট রোগ (ক্যান্সার) হতে দেহকে রক্ষা করে। ত্বকের এপিডার্মিসের কোষে মেলানিন (melanin) জাতীয় রঞ্জক পদার্থ সৃষ্টি হয় যা অতি বেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে।

২। **ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া হতে সুরক্ষা** (Protection from Bacteria and Viruses): ত্বক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ত্বকের বাইরের আবরণ খসে পড়ার সময় তৎসংলগ্ন অণুজীবগুলো অপসারিত হয়। এছাড়া ত্বকে অসংখ্য উপকারি ব্যাকটেরিয়া থাকে যেগুলো ক্ষতিকর অণুজীবদের আক্রমণ হতে দেহকে রক্ষা করে।

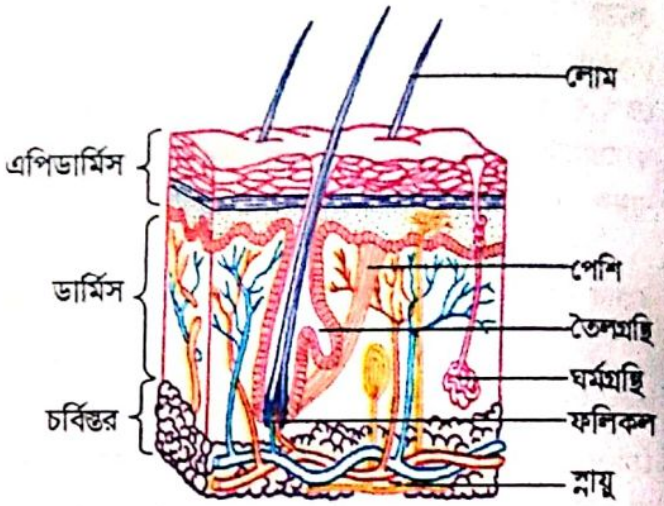

চিত্র ১০.২ মানুষের ত্বকের আণুবীক্ষণিক গঠন

৩। **ক্ষত সারানো** (Remedy of wounds): দেহের কোনো অংশ কেটে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হলে সেখানে দ্রুত জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। ত্বক এসব জীবাণু প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ত্বকের রক্ত প্রবাহ এসব জীবাণুকে বহিষ্কার করে এবং রক্ততঞ্চন ঘটানো শুরু করে। রক্ততঞ্চনে একটি আবরণ সৃষ্টি হয় যা জীবাণুকে দেহে প্রবেশে বাধা দেয়। এসময় ত্বকের এপিডার্মিস থেকে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে ক্ষতের মুখ বন্ধ করে ফেলে।

৪। **ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ** (Langerhans cells): ত্বকের এপিডার্মিসে ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক বিশেষ এক ধরনের কোষ থাকে। ত্বক যখন কোনো জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন একোষগুলো এক ধরনের সতর্ক সংকেত পাঠায় যাতে অনাক্রম্যতন্ত্র সাড়া প্রদান করে।

৫। **অন্যান্য কাজ**

- ত্বকের এপিডার্মিসের স্ট্রাটাম কর্নিয়ামে (stratum corneum) কিছু মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টেরল থাকে যেগুলো *Staphylococcus aureus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি রোধ করে।
- ত্বকের এপিথেলিয়াল কোষ কেরাটিনোসাইটস থেকে অণুজীব প্রতিরোধী পেপটাইড β ডিফেনসিন (β-defensins) তৈরি হয় যা *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* *Escherichia coli* ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এছাড়া β ডিফেনসিন কেমোকাইন গ্রাহী CCR6 এর মাধ্যমে ডেনড্রাইটিক কোষ এবং মেমরি T কোষকে আকর্ষণ করে যা ত্বকের সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতার মধ্যে সংযোগ ঘটায়।
- ত্বকে অন্য এক ধরনের অণুজীব প্রতিরোধী পেপটাইড ক্যাথিলেসিডিন (cathelicidins) শনাক্ত করা হয়েছে যা ত্বককে *Streptococcus* এর সংক্রমণ হতে রক্ষা করে।
- ত্বকের কেরাটিনোসাইটস থেকে সাইটোকাইন, নিউরোপেপটাইড ও ইকোসানয়েড ক্ষরিত হয় যেগুলো বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে।

CamScanner

ত্বকে সাধারণত নিউট্রোফিল থাকে না। কিন্তু কোনো জীবাণুর আক্রমণে যখন ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হয় তখন অসংখ্য নিউট্রোফিলের আগমণ ঘটে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

যদিও ত্বক আমাদের দেহের একটি ভালো প্রতিরক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে কিন্তু এটি দেহের সার্বিক প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। ত্বক নিজেও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক কিংবা ক্ষুদ্র পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়। ত্বকের কয়েকটি প্রধান সংক্রমণ হলো: ফোড়া (boils), ছোঁয়াচে ঘা (impetigo), দাদ (ringworm), আঁচিল (wart), খোস-পাঁচড়া (scabies), একজিমা (eczema), কচ্ছুরোগ (psoriasis) ইত্যাদি।

১০.২.২ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাক এনজাইম ও অ্যাসিডের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর)

(Role of digestive enzyme and acid in killing bacteria)

খাদ্যে বিষক্রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া। কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা খাদ্য দূষিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে খাদ্যে বিষক্রিয়ার মাত্রা ও লক্ষণ। মানুষের অসুস্থতার জন্য দায়ী রোগ সৃষ্টিকারী খাদ্যবাহিত প্রধান ব্যাকটেরিয়া হলো: *Salmonella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Shigella flexneri*, *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, *Bacillus cereus*, *Campylobacter jejuni*, *Clostridium botulinum*, *Cyclospora cayetanensis*, *Escherichia coli*, *Vibrio cholerae* ইত্যাদি। দেহ বিভিন্ন উপায়ে এসব খাদ্যবাহিত ব্যাকটেরিয়াকে দমন করে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা খাদ্য অল্প মাত্রায় দূষিত হলে খাদ্য পরিপাককারী কিছু এনজাইম ও পাকস্থলির অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধ্বংস করে। এছাড়া পিত্ত ও পরিপাকনালির মিউকাস ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে কিছু ভূমিকা রাখে।

১। **পরিপাক এনজাইম:** লালাগ্রন্থি নিঃসৃত লাইসোজাইম এনজাইম (lysozyme enzyme) মুখবিবরে খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

অগ্ন্যাশয় রসে বিদ্যমান প্রোটিয়েজ এনজাইম (protease enzyme) অন্ত্রে বিদ্যমান ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ধ্বংস করে। এছাড়া প্রোটিয়েজ এনজাইম অ্যান্টিবায়োটিকসের সাথে সিনারজিসটিক ক্রিয়া (synergistic effect) করে অধিক কার্যকরভাবে ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

মিউকাস গ্রন্থি ও লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ল্যাকটোপারঅক্সাইড এনজাইম প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে এবং গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।

২। **পাকস্থলির অ্যাসিড:** মানুষের পাকস্থলির প্রাচীরের বিদ্যমান প্যারাইটাল কোষ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয় যা পাকস্থলির ভেতরের পরিবেশকে অম্লীয় করে। পাকস্থলির প্রাচীরের মিউকাস কোষ থেকে পিচ্ছিল মিউকাস নিঃসৃত হয় যা পাকস্থলির অন্যান্য কোষকে অম্লীয় পরিবেশ হতে রক্ষা করে। পাকস্থলির লুমেনে অম্লের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে এর pH মান কমে যায়। সাধারণত pH মান 2 এর কম হলে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়। কিন্তু পাকস্থলির pH মান দীর্ঘ সময় 2 এর নিচে থাকে না। খাদ্যগ্রহণের সময় পাকস্থলিতে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে এবং এ সময়ই pH মান বেড়ে যায়। এর গবেষণায় দেখা গেছে অণুজীবসমূহ pH মান 1.0 – 2.0 এর মধ্যে বাঁচতে পারে না কিন্তু pH মান 4 এর মধ্যে বাঁচে।

৩। **মিউকাস:** দেহের অধিকাংশ নালি বিশেষ করে পৌষ্টিকনালি ও শ্বসননালির অন্তর্ভাগ মিউকাস আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। সাধারণত মিউকাসে ব্যাকটেরিয়ানাশক অনেক উপাদান, যেমন -লাইসোজাইম এনজাইম ও ইমিউনোগ্লোবিন A (IgA) থাকে। এরা ব্যাকটেরিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়ে তাদেরকে পোষক কলার সংস্পর্শ হতে বিরত রাখে।

৪। **পিত্তরস:** যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে পিত্তরস পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনে ক্ষুদ্রান্ত্রে মুক্ত হয়। পিত্তরসের প্রধান কাজ পরিপাক হলেও এতে বিদ্যমান পিত্তলবণ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম।

CamScanner

১০.৩ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলের ভূমিকা (দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর)

(Role of Neutrophils and Macrophage in killing bacteria)

দেহের কিছু কোষ বিভিন্ন অণুজীব ও ভাইরাসকে ভক্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করে। এসব কোষকে ফ্যাগোসাইটস (phagocytes) বলে। প্রধানত দুধরনের ফ্যাগোসাইটস একাজে অংশ গ্রহণ করে। এরা হলো নিউট্রোফিল (neutrophils) ও ম্যাক্রোফেজ (macrophages)। এরা ভক্ষণ প্রক্রিয়ায় অণুজীব ধ্বংস করে বলে এদের প্রফেশনাল ফ্যাগোসাইটস (professional phagocytes) বলে।

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে নিউট্রোফিলের ভূমিকা

নিউট্রোফিল এক ধরনের শ্বেত রক্ত কণিকা। শ্বেত রক্ত কণিকার 50-60%ই নিউট্রোফিল। মানুষের এক লিটার রক্তে প্রায় 5 বিলিয়ন নিউট্রোফিল থাকে। এগুলো স্বল্প আয়ু বিশিষ্ট, সর্বোচ্চ 5 দিন বাঁচে। অস্থি মজ্জার স্টেম কোষ থেকে সর্বদা নিউট্রোফিল উৎপন্ন হতে থাকে। এদের অর্ধেক রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয় এবং অর্ধেক রক্তবাহিকার প্রাচীরে সংলগ্ন থাকে। নিউট্রোফিলে বিদ্যমান লাইসোসোমে অণুজীব ধ্বংসকারী ও পরিপাককারী এনজাইম থাকে যা ভক্ষণের পর ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

কোনো সংক্রমিত স্থান হতে উপযুক্ত সংকেত পাওয়ার পর নিউট্রোফিল 30 মিনিটের মধ্যে রক্তপ্রবাহ ত্যাগ করে সংক্রমিত স্থানে পৌছায়। একবার রক্তপ্রবাহ হতে বের হয়ে কলা, পরিপাকনালি বা শ্বসননালিতে নিউট্রোফিল প্রবেশ করলে উহা আর রক্তস্রোতে ফিরে আসে না। এরা খুব দ্রুত সংক্রমণকারী অণুজীবকে ভক্ষণ করে নিজে মরে যায় এবং পুঁজ কোষরূপে (pus cells) দেহ হতে বহিষ্কৃত হয় ।

নিউট্রোফিল বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে যা মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজকে IgG অ্যান্টিবডি আবৃত ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণের জন্য উদ্দীপিত করে। এ রাসায়নিক পদার্থ শ্বেত রক্ত কণিকার ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় হার বৃদ্ধি করে এবং আন্তঃকোষীয় হত্যাযজ্ঞের জন্য সক্রিয় অক্সিজেন যৌগ গঠন করে।

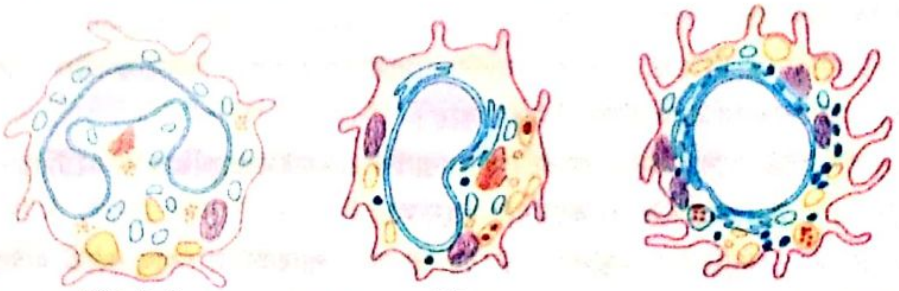

নিউট্রোফিল মনোসাইট ম্যাক্রোফেজ

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজের ভূমিকা

ম্যাক্রোফেজ বৃহদাকৃতির শ্বেত রক্তকণিকা। রাশিয়ান অণুজীব বিজ্ঞানী আইলা মিকনিকভ (Ilya Mechnikov), 1884 সলে ম্যাক্রোফেজ আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে অস্থিমজ্জার স্টেম কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এসব রক্তকণিকা মনোসাইটস (monocytes) রূপে রক্তে পরিভ্রমণ করে । রক্তে পরিভ্রমণকারী শ্বেত রক্ত কণিকার মাত্র 3-7% হলো মনোসাইটস। এরা সক্রিয় ফ্যাগোসাইট এবং ব্যাকটেরিয়ানাশক। জন্মের 2 দিনের মধ্যে এরা রক্তস্রোত ত্যাগ করে বিভিন্ন কলায় চলে আসে এবং স্থিতু হয়ে আকারে বড় হয়। এদের তখন ম্যাক্রোফেজ বা বৃহৎ খাদক (macrophages, or big eaters) বলে। দেহের সকল ম্যাক্রোফেজকে একত্রে মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট তন্ত্র (system of mononuclear phagocyte) বলে। এ তন্ত্র সকল যোজক কলা, রক্তনালির ভিত্তি পর্দা, যকৃতের সাইনোসয়েড, প্লীহা, ফুসফুস, অস্থিমজ্জা এবং লসিকা গ্রন্থিতে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত থাকে। ম্যাক্রোফেজগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় মনোসাইটস থেকে অধিক সক্রিয় এবং এরা হাইড্রোলাইটিক এনজাইমযুক্ত অসংখ্য দানাদার গঠন বহন করে।

ম্যাক্রোফেজগুলো ফ্যাগোসাইটস হিসেবে প্রধানত ক্রনিক ধরনের সংক্রমণে কাজ করে। সংক্রমিত স্থানের প্রদাহ দ্বারা তাড়িত হয়ে এরা ঐ স্থানে পৌছায় এবং সক্রিয়ভাবে অণুজীব, দেহের মৃতকোষ, আঘাতপ্রাপ্ত কোষ এবং অন্যান্য ময়লা ভক্ষণ করে। এছাড়া এরা সাইটোকাইনস (cytokines) নামক গুরুত্বপূর্ণ অনাক্রম্য প্রোটিন বা হরমোন ক্ষরণ করে যা দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়াদানে প্রধান ভূমিকা রাখে। এধরনের অনাক্রম্য সাড়াদানকে 'প্রদাহিক সাড়াদান (inflammatory response)' বলে। লসিকা গ্রন্থিগুলোতে এরা খাদক হিসেবে বিদ্যমান থেকে রক্তপ্রবাহ থেকে বহিরাগত পদার্থ অপসারণ করে।

সংক্রমক শনাক্তকরণ (Identification of Pathogen)

নিউট্রোফিল এবং ম্যাক্রোফেজের নিজস্ব কিছু ক্ষমতা দ্বারা অণুজীবকে শনাক্ত করে ফ্যাগোসাইটোসিস শুরু করতে পারে। এদের প্লাজমা আবরণীতে কিছু রাসায়নিক সহজাত গ্রাহক (innate receptors) পদার্থ থাকে যাদের মাধ্যমে এরা সহজেই অণুজীবদের শনাক্ত করে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়া শুরু করে। যেসব পদার্থ দ্বারা নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ অণুজীবকে শনাক্ত করে তাদের সাথে যুক্ত হয়, সেসব পদার্থকে অপসোনিন (opsonin) বলা হয়। অ্যান্টিবডি (যেমন IgG) এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ যা দ্বারা এরা অণুজীবের দেহতলের বিশেষ অণুকে শনাক্ত করতে পারে।

ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়া (Phagocytic Process)

যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাগোসাইটসমূহ ভক্ষণের মাধ্যমে অণুজীব ধ্বংস করে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বলে। রক্তের নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ কয়েকটি ধারাবাহিক ঘটনার মাধ্যমে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। নিম্নে ম্যাক্রোফেজের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করা হলো:

১। **সংক্রমিত স্থানে ফ্যাগোসাইটিক কোষের আগমন বা মুক্ত হওয়া** (Delivery of phagocytic cells to the site of infection): দেহের কোনো স্থান অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত হলে সংক্রমিত স্থানে খুব দ্রুত ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলোর আগমন ঘটে। অণুজীব দ্বারা সংক্রমিত স্থানে ফ্যাগোসাইটিক কোষ, মনোসাইটস বা নিউট্রোফিলের আগমণ দুটি প্রক্রিয়ার সম্পন্ন হয়, যেমন-

(ক) **ডায়াপেডিসিস** (Diapedisis): সংক্রমিত স্থানের কোষগুলোর প্রদাহের ফলে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেমন- হিস্টামিন, কাইনিন, প্রোস্টাগ্লান্ডিন ইত্যাদি সৃষ্টি করে যাদের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ফ্যাগোসাইটগুলো সংক্রমিত স্থানে চলে আসে।

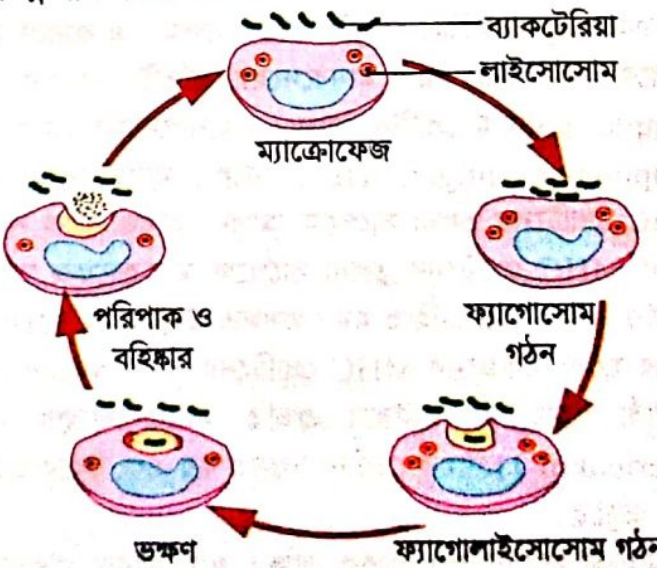

চিত্র ১০.৩ ম্যাক্রোফেজের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া

(খ) **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis): ফ্যাগোসাইটস কোষের কেমোট্যাকটিক সাড়াদানের মাধ্যমে সংক্রমিত স্থানে এদের বিপুল সমাগম ঘটে। মনোসাইটস বা নিউট্রোফিল উভয় ধরনের কোষেই বেশ কয়েক ধরনের কেমোট্যাকটিক আকর্ষক শনাক্তকরণ করা হয়েছে।

২। **অণুজীবের সাথে সংযুক্তি** (Phagocytic adherence): ফ্যাগোসাইটিক কোষের প্লাজমা আবরণীতে কিছু রাসায়নিক গ্রাহক পদার্থ থাকে যাদের মাধ্যমে এরা সহজেই অণুজীবদের সাথে সংযুক্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া শুরু করে।

৩। ভক্ষণ (Ingestion): অণুজীবের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ফ্যাগোসাইটের প্লাজমা আবরণীতে এক ধরনের গাঠনিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন আসে। ফলে এটি অণুজীবের চারদিকে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে উহাকে ঘিরে ফেলে এবং পরিশেষে ইনভ্যাজিনেশন প্রক্রিয়ায় সাইটোপ্লাজমের ভেতরে নিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়াকে ইনজেসশন বা ভক্ষণ বলে। ভক্ষণের ফলে অণুজীবটি ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্লাজমা আবরণী দ্বারা আবৃত হয়ে খাদ্য গহ্বর হিসেবে অবস্থান করে। একে ফ্যাগোসোম (phagosome) বলে।

৪। ফ্যাগোলাইসোসোম গঠন (Formation of the phagolysosome): ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমে বিদ্যমান এক বা একাধিক লাইসোসোম ফ্যাগোসোমের সাথে মিলিত হয়ে পরিপাক গহ্বর ফ্যাগোলাইসোসোম (phagolysosome) গঠন করে।

৫। অণুজীবদের অন্তঃকোষীয় মরণ (Intracellular killing of microorganisms): ফ্যাগোলাইসোসোম গঠিত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া তার বংশবৃদ্ধি ক্ষমতা হারায়। ভক্ষণের 10 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে লাইসোসোমাল এনজাইমের ক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটে।

৬। অণুজীবদের অন্তঃকোষীয় পরিপাক (Intracellular digestión of microorganisms): মৃত ব্যাকটেরিয়ার উপর বিভিন্ন পরিপাক এনজাইম যেমন- লাইসোজাইম, লাইপেজ, নিউক্লিয়েজ এবং গ্লাইকোলাইসেস ক্রিয়া করে উহার পরিপাক ঘটায়। পরিপাকের পর নিউট্রোফিল জাতীয় ফ্যাগোসাইট মরে যায় এবং পুঁজ কোষরূপে দেহ হতে বহিষ্কৃত হয়। ম্যাক্রোফেজগুলো পরিপাককৃত বর্জ্য পরিত্যাগ করে নতুনভাবে ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

ম্যাক্রোফেজের অনাক্রম্যতায় সাড়াদান

ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ ছাড়াও ম্যাক্রোফেজ B ও T লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ কারণে ম্যাক্রোফেজকে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। মানবদেহের প্রতিটি কোষের প্লাজমা পর্দায় MHC (major histocompatibility complex) নামক প্রোটিন থাকে। মানবদেহের এসব MHC-কে হিউমেন লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেন (human lymphocyte antigen -HLA) বলে। ম্যাক্রোফেজ নিজের MHC প্রোটিনের সাথে দেহের অন্যান্য কোষের MHC প্রোটিনের তুলনা সাপেক্ষে আপন কোষগুলোকে শনাক্ত করতে পারে। বহিরাগত কোনো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে MHC প্রোটিনের তুলনা সাপেক্ষে ম্যাক্রোফেজ তাদের চিনতে পারে। ভাইরাস ও অন্যান্য বহিরাগত বিষাক্ত পদার্থও এদের দ্বারা চিহ্নিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে MHC প্রোটিন MHC জিন দ্বারা সংশ্লেষিত হয় এবং আঙ্গুলের ছাপের মতো একজনের MHC প্রোটিনের সাথে অপরের প্রোটিনের কোনো মিল পাওয়া যায় না। বহিরাগত জীবাণু, পরজীবী কোষ বা ভাইরাস প্রভৃতি ম্যাক্রোফেজের সংস্পর্শে আসলে ম্যাক্রোফেজ হতে ইন্টারলিউকিন-1 (interleukin-1) নামক প্রোটিন নিঃসৃত হয় এবং উহার প্রভাবে লিম্ফোসাইট কোষগুলো উদ্বুদ্ধ হয়ে অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগায়।

এছাড়া ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে জীবাণু পরিপাক হলে উহার কিছু প্রোটিন (অ্যান্টিজেন) ম্যাক্রোফেজের প্লাজমা পর্দায় MHC প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ অবস্থায় উহা লিম্ফোসাইট কর্তৃক চিহ্নিত হয় ও সক্রিয় হয়ে উঠে।

১০.৪ সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতা (তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর)

(The innate and acquired immunity)

অনাক্রম্যতা দেহের এমন একটি অবস্থা যার দ্বারা জীব কোনো সংক্রমণ, রোগ বা অন্য কোনো জৈবিক আক্রমণ থেকে যথোচিতভাবে জৈবিক সুরক্ষা লাভ করে। এর দ্বারা দেহ কোনো ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। অনাক্রম্যতা প্রধানত দুধরনের, যথা- সহজাত অনাক্রম্যতা ও অর্জিত অনাক্রম্যতা।

CamScanner

১। সহজাত অনাক্রম্যতা বা নন-স্পেসিফিক অনাক্রম্যতা
(The innate immunity or non-specific immunity)

মানবদেহের যে সব অনাক্রম্যতা জিনগত গঠনের কারণে প্রাকৃতিকভাবে বা জন্মগতভাবে আসে তাদের সহজাত বা বংশগত অনাক্রম্যতা বলে। এটি একটি নন-স্পেসিফিক ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা কোনো অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশের সাথে সাথে বা এক ঘণ্টার মধ্যে সক্রিয় হয়। ত্বক, নিউট্রোফিল, প্রাকৃতিক মারণকোষ, মিউকাস পর্দা, পাকস্থলির অ্যাসিড, লালারস, অশ্রু প্রভৃতি দ্বারা জীবাণু কিংবা পরজীবীর বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখা যায় তা সহজাত প্রকৃতির। জিনগত গঠনের ভিত্তিতে দেহে এ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। অনির্দিষ্টভাবে এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সারাজীবন পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রহরীর মতো দেহে অবস্থান করে। জিনগত প্রকৃতির উপর এ ধরনের অনাক্রম্যতা প্রতিষ্ঠিত বলে একে জেনেটিক অনাক্রম্যতা (genetic immunity) বলে।

সহজাত অনাক্রম্যতার বৈশিষ্ট্য

- বিশেষ ধরনের রাসায়নিক মধ্যস্থতাকারী বা মেডিয়েটর সাইটোকাইন উৎপাদনের মাধ্যমে এটি সংক্রমণ স্থানে অনাক্রম্য কোষ নিয়োজিত করে।
- ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ এবং অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স বা মৃত কোষ অপসারণের জন্য এটি কমপ্লিমেন্টতন্ত্রকে সক্রিয় করে।
- বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকার মাধ্যমে এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, কলা, রক্ত বা লসিকা থেকে বহিরাগত বস্তু অপসারণ ও শনাক্ত করে।
- অ্যান্টিজেন উপস্থাপন (antigen presentation) পদ্ধতির মাধ্যমে এটি অর্জিত অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে।
- সংক্রমণ প্রতিনিধির ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

সহজাত অনাক্রম্যতার প্রকার

সহজাত অনাক্রম্যতা নিম্নলিখিত তিন ধরনের হয়, যেমন-

(ক) প্রজাতিগত অনাক্রম্যতা (Species immunity): এটি এমন এক ধরনের সহজাত অনাক্রম্যতা যা কেবল একটি প্রজাতির সকল সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- গো-বসন্তের ভাইরাস (cowpox virus) দ্বারা গবাধিপশু আক্রান্ত হয় কিন্তু অতি নিকট সম্বন্ধীয় গুটিবসন্তের ভাইরাসের (smallpox virus) প্রতি এদের প্রজাতিগত অনাক্রম্যতা দেখা যায়। আবার গুটিবসন্তের ভাইরাস মানুষের মৃত্যুর কারণ হলেও প্রজাতিগত অনাক্রম্যতার কারণে গো-বসন্তের ভাইরাস মানুষের ত্বকে সামান্য সংক্রমণ সৃষ্টি করে।

(খ) গোষ্ঠীগত অনাক্রম্যতা (Racial immunity): এটি এমন এক ধরনের সহজাত অনাক্রম্যতা যা কেবল একটি প্রজাতির নির্দিষ্ট রেস বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- উত্তর ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ মানুষে যক্ষ্মার (tuberculosis) রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ অপেক্ষা বেশি। অন্যদিকে আফ্রিকান কিছু জটিল রোগের প্রতি আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি হলেও ইউরোপিয়ান শ্বেতাঙ্গরা এসব রোগে সচরাচর মারা যায়।

(গ) ব্যক্তিগত অনাক্রম্যতা (Individual immunity): এটি এমন এক ধরনের সহজাত অনাক্রম্যতা যা একটি প্রজাতির সকল সদস্য বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং প্রজাতির প্রতিটি সদস্য স্বতন্ত্রভাবে নিজস্ব ক্ষমতা দ্বারা পরজীবীর আক্রমণ বা সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

২। অর্জিত অনাক্রম্যতা বা স্পেসিফিক অনাক্রম্যতা (The acquired immunity or specific immunity)

মানবদেহে রোগের জীবাণু বা পরজীবী প্রবেশের পর যে অনাক্রম্যতা জেগে উঠে তাকে অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে। এটি একটি স্পেসিফিক ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা জীবাণু বা পরজীবীর পুনঃআক্রমণ রোধ করে। এটি কোনো ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী এবং কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছরের জন্য স্থায়ী হয়।

CamScanner

অর্জিত অনাক্রম্যতার বৈশিষ্ট্য

- **সুনির্দিষ্টতা:** অর্জিত অনাক্রম্যতা কেবল সুনির্দিষ্ট সংক্রমকের বিরুদ্ধে কাজ করতে সক্ষম।
- **বৈচিত্র্য:** এটি অসংখ্য বহিরাগত অণু শনাক্ত করতে সক্ষম।
- **স্বজাতীয় ও বিজাতীয় পার্থক্যকরণ:** অর্জিত অনাক্রম্যতা দেহে বিদ্যমান (স্বজাতীয়) কোনো অণুর বিরুদ্ধে কাজ করে না কিন্তু বহিরাগত (বিজাতীয়) যে কোনো অণুর বিরুদ্ধে কাজ করে অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় পার্থক্য করতে সক্ষম।
- **স্মৃতি:** অর্জিত অনাক্রম্যতা দেহে কোনো আক্রমণকারী বা সংক্রমকের বিরুদ্ধে প্রথম অনাক্রম্য সাড়াদান করে। এটি স্মৃতি হিসেবে দেহে বিদ্যমান থাকে এবং ঐ একই আক্রমণকারী বা সংক্রমক যদি পুনরায় দেহকে সংক্রমিত করে তাহলে এরা খুব দ্রুত অনাক্রম্যতায় সাড়া দিয়ে এদেরকে (সংক্রমককে) প্রতিরোধ করে।

অর্জিত অনাক্রম্যতার প্রকার: অর্জিত অনাক্রম্যতা প্রধানত দুধরনের, যথা-

(ক) সক্রিয় বা অ্যাকটিভ অনাক্রম্যতা (Active immunity): দেহের নিজস্ব ব্যবস্থার দ্বারা কোনো অনাক্রম্যতা অর্জিত হলে তাকে সক্রিয় অনাক্রম্যতা বলে। দেহে জীবাণু বা পরজীবী প্রবেশের পর এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং জীবাণু বা পরজীবীকে ধ্বংস করে। T লিম্ফোসাইট দ্বারা জীবাণু দমন কিংবা B লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি ক্ষরণের মাধ্যমে জীবাণু দমন ব্যবস্থা সক্রিয় অনাক্রম্যতার পরিচায়ক।

- কীভাবে দেহে কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে সক্রিয় অনাক্রম্যতা দুধরনের হয়, যেমন-

(i) কোষ মাধ্যম অনাক্রম্যতা (Cellular immunity or cell mediated immune system-CMIS): অনাক্রম্যতন্ত্রের বিশেষ কোষ যখন সরাসরি দেহের ভেতরে সক্রিয়ভাবে জীবাণু ও পরজীবী প্রতিরোধ করে তখন তাকে কোষ মাধ্যম অনাক্রম্যতা বলে। এক্ষেত্রে T লিম্ফোসাইট প্রধান ভূমিকা রাখে। T লিম্ফোসাইট তিনভাবে কাজ করে, যেমন- এরা জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে, সরাসরি আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে এবং সাইটোকাইন নিঃসরণ করে পার্শ্ববর্তী পরিবেশের পরিবর্তন করে।

(ii) রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতা (Humoral immunity or antibody mediated immune system - AMIS): অনাক্রম্যতন্ত্রের বিশেষ কোষ থেকে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়ে রক্তরস, লসিকা বা কলারস বাহিত হয়ে অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণের মাধ্যমে যখন জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে তখন তাকে রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতা বলে। এক্ষেত্রে B লিম্ফোসাইট প্রধান ভূমিকা রাখে। B লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে যা সুনির্দিষ্টভাবে বহিরাগত অণুজীব ও তাদের সৃষ্ট বিষের সাথে যুক্ত হয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে।

- কীভাবে দেহে অর্জিত হয় এর উপর ভিত্তি করে সক্রিয় অনাক্রম্যতা দুধরনের হয়, যেমন-

(i) প্রকৃতিগতভাবে অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Naturally acquired active immunity): দেহে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে উহার অ্যান্টিজেনের প্রভাবে রক্তের লিম্ফোসাইট কোষগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে। এদের কোনোটি ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে আবার কোনোটি অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করে। কিছু লিম্ফোসাইট সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে স্মৃতিকোষ (memory cell) সৃষ্টি করে, যারা রক্তের মধ্যে দীর্ঘদিন মজুত থাকে এবং ভবিষ্যতে পূর্ব প্রকার জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে তাদের শনাক্ত করে সহজে ও দ্রুত দমন করতে পারে। এ ধরনের অনাক্রম্যতাকে প্রকৃতিগতভাবে অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা বলে। হাম ও গুটি বসন্তের বিরুদ্ধে দেহে এ ধরনের অনাক্রম্যতা অর্জিত হয়।

(ii) কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Artificially acquired active immunity): টিকা (vaccine) প্রয়োগ দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দেহে সক্রিয় অনাক্রম্যতা জাগিয়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে টিকা রোগের কোনোরকম লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াই জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাথমিক সাড়া প্রদানে লিম্ফোসাইটকে উদ্দীপিত করে। মৃত কিংবা দুর্বল সংক্রমক থেকেই টিকা উৎপাদন করা হয়। দেহে হেপাটাইটিস A ও B এবং রুবেলা ভাইরাসের বিরুদ্ধে টিকাদানের কৃত্রিম উপায়ে সক্রিয় অনাক্রম্যতা অর্জিত হয়।

(খ) পরোক্ষ বা প্যাসিভ অনাক্রম্যতা (Passive immunity): জীবাণু প্রতিরোধের জন্য দেহ যখন অন্য দেহ হতে অ্যান্টিবডি গ্রহণ করে অনাক্রম্যতা লাভ করে তখন তাকে পরোক্ষ বা প্যাসিভ অনাক্রম্যতা বলে। পরোক্ষ অর্জিত অনাক্রম্যতা দুধরনের হয়, যেমন-

(i) প্রকৃতিগতভাবে অর্জিত পরোক্ষ অনাক্রম্যতা (Naturally acquired passive immunity): মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় শিশু অমরার (placenta) মাধ্যমে মাতৃদেহ হতে যে অ্যান্টিবডি (IgG) লাভ করে উহার সাহায্যে জন্মের পর অনেকদিন পর্যন্ত জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। এছাড়া শিশু মাতৃদুধের মাধ্যমে IgA জাতীয় অ্যান্টিবডি প্রাপ্ত হয় যা শিশুর দেহের জীবাণু প্রতিরোধে সহায়তা করে। মানব শিশুর দেহে এভাবে অর্জিত অনাক্রম্যতা প্রাকৃতিকভাবে অর্জিত পরোক্ষ অনাক্রম্যতা।

(ii) কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত পরোক্ষ অনাক্রম্যতা (Artificially acquired passive immunity): কৃত্রিমভাবে অন্য প্রাণীর দেহে জীবাণু প্রবেশ করিয়ে অনেকক্ষেত্রে রোগজীবাণু প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়। মানবদেহে এ অ্যান্টিবডি ব্যবহার দ্বারা রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। এমনভাবে অর্জিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত পরোক্ষ অনাক্রম্যতা বলে। জলাতঙ্ক (hydrophobia) প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টির‍্যাবিজ (antirabies) প্রতিষেধক ব্যবহার এ প্রকার অনাক্রম্যতার উদাহরণ।

সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতার পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	সহজাত অনাক্রম্যতা	অর্জিত অনাক্রম্যতা
১। অনাক্রম্যতা প্রদায়ী উপাদান	জিনঘটিত বা শারীরবৃত্তীয়।	অ্যান্টিজেন প্রণোদিত বা পূর্বঘটিত অ্যান্টিবডি।
২। যেভাবে আবির্ভূত হয়	জিনের বহিঃপ্রকাশ দ্বারা।	রোগভোগ অথবা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে।
৩। সাড়াদানের সময়কাল	জীবাণু প্রবেশের কয়েক মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যে।	অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি পাওয়ার 5-14 দিন পর।
৪। অনাক্রম্যতার স্থায়ীকাল	সারাজীবন।	কয়েকদিন হতে সারাজীবন।
৫। মেমোরি সাড়াদান	ঘটে না।	ঘটে।
৬। রক্ত বা কলারসের দ্রবীভূত উপাদান	অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড ও প্রোটিন।	অ্যান্টিবডি।
৭। প্রধান কোষীয় উপাদান	ফ্যাগোসাইটস, কিলার কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ।	B লিম্ফোসাইট ও T লিম্ফোসাইট।

রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতা ও কোষ মাধ্যম অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য

রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতা বা AMIS	কোষ মাধ্যম অনাক্রম্যতার বা CMIS
১। এটি এক ধরনের অর্জিত অনাক্রম্যতা যা প্রধানত B কোষ নিঃসৃত অ্যান্টিবডি দ্বারা সংঘটিত হয়।	১। এটি এক ধরনের অর্জিত অনাক্রম্যতা যা প্রধানত অ্যান্টিজেন-নির্ধারক T কোষ দ্বারা সংঘটিত হয়।
২। B কোষ, T কোষ ও ম্যাক্রোফেজ এর প্রধান কোষীয় উপাদান।	২। হেলপার T কোষ, সাইটোটক্সিক T কোষ, NK কোষ ও ম্যাক্রোফেজ এর প্রধান কোষীয় উপাদান।
৩। এ ধরনের অনাক্রম্যতা বহিঃকোষীয় অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস) এবং এদের সৃষ্ট বিষের উপর কাজ করে।	৩। এ ধরনের অনাক্রম্যতা অন্তঃকোষীয় অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস), পরজীবী এবং টিউমার কোষের উপর কাজ করে।
৪। এক্ষেত্রে প্লাজমা B কোষ অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।	৪। এক্ষেত্রে T কোষ সাইটোকাইন ক্ষরণ করে।
৫। এটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সংঘটিত হয়।	৫। এটি খুব ধীর গতিতে সংঘটিত হয়।
৬। এটি প্রতিস্থাপিত কোষ (transpalnts) ও টিউমার কোষে সাড়া দেয় না।	৬। এটি প্রতিস্থাপিত কোষ (transpalnts) ও টিউমার কোষে সাড়া দেয়।

CamScanner

১০.৫ অনাক্রম্যতায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা (Roles of antibody in Immunity)

অ্যান্টিবডি (antibody)

অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে ও প্রভাবে যে উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট প্রোটিন জাতীয় বস্তু গ্রহীতার দেহে বিশেষায়িত কোষ (B cells) থেকে তৈরি হয় এবং নির্দিষ্টভাবে অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে আন্তঃক্রিয়া করে তাকে অ্যান্টিবডি বলে। জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিচ (Paul Ehrlich) 1897 সালে তাঁর পার্শ্ব-শিকল মতবাদে সর্বপ্রথম antibody শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে অ্যান্টিবডি হলো রক্তের B লিম্ফোসাইট বা প্লাজমা B কোষ বা প্লাজমা কোষ নিঃসৃত গ্লাইকোপ্রোটিন (glycoprotein) জাতীয় বৃহদাকৃতির রাসায়নিক অণু। দেহের প্রয়োজনে একটি B লিম্ফোসাইট প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করতে পারে। মানবদেহে প্রায় 100 মিলিয়ন ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। প্রতিটি অ্যান্টিবডি গঠনে অনন্য (unique) এবং সুনির্দিষ্ট ধরনের অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করে। অ্যান্টিবডি রক্ত প্রোটিনের গামা গ্লোবিউলিন (gamma globulin) অংশ গঠন করে। এদেরকে রাসায়নিকভাবে ইমিউনোগ্লোবিন (immunoglobulins=Ig) বলে। এগুলো রক্তের প্লাজমা ও কলারসে বিদ্যমান থাকে।

অ্যান্টিবডির গঠন (Structure of antibody)

প্রতিটি অ্যান্টিবডি একটি ইমিউনোগ্লোবিন (Ig) মনোমার। প্রতিটি ইমিউনোগ্লোবিন Y আকৃতির অণু যা চারটি পলিপেপটাইড শিকল নিয়ে গঠিত হয়। এদের দুটি শিকল দৈর্ঘ্যে ছোট এবং দুটি শিকল দৈর্ঘ্যে বড়। ছোট ও বড় আকৃতির শিকলদের যথাক্রমে হালকা শিকল (light chains) ও ভারী শিকল (heavy chains) বলা হয়। প্রতিটি শিকলের দুটি নির্দিষ্ট অংশ আছে। একটি অংশ স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল, এদের C_L ও C_H (C=constant) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অপর অংশটি অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল, এদের V_L ও V_H (V=variable) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারী শিকলের একটি অস্থায়ী (V_H) অংশ এবং তিনটি স্থায়ী অংশ (C_{H1}, C_{H2}, C_{H3}) থাকে। হালকা শিকলে কেবল একটি অস্থায়ী (V_L) অংশ এবং একটি স্থায়ী অংশ (C_L) থাকে।

ছোট ও হালকা পলিপেপটাইড শিকল 220টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে বড় ও ভারী পলিপেপটাইড শিকল 440টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত। চারটি পলিপেটাইড শিকল পরস্পর ডাইসালফাইড (disulphide) বন্ধনী দ্বারা পাশাপাশি যুক্ত হয়ে Y আকৃতির অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিন সৃষ্টি করে। Y আকৃতির অ্যান্টিবডি অণুর দীর্ঘ দণ্ডাকৃতির অংশটি কেবল ভারী পলিপেপটাইড শিকলের স্থায়ী অংশ (C) দ্বারা গঠিত। একে **Fc অঞ্চল** (fragment crystallisable region) বলে। অপরদিকে Y এর প্রসারিত দুই বাহু অংশ হাল্কা ও ভারী উভয় ধরনের পলিপেটাইড শিকল দ্বারা গঠিত। Y এর দু বাহুর দুটি স্থান দ্বারা অ্যান্টিজেনের সাথে আবদ্ধ হয়। এদের **Fab অঞ্চল** (fragment antigen binding region) বলা হয়।

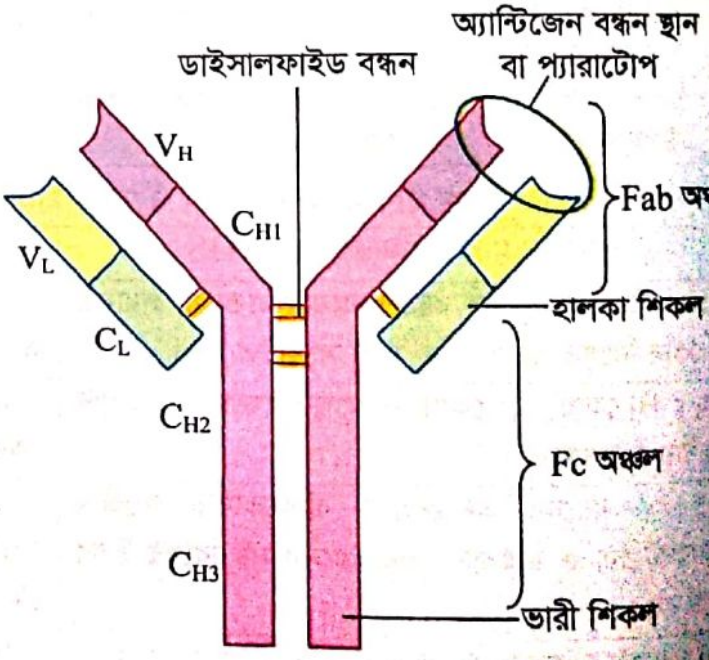

চিত্র ১০.8 একটি অ্যান্টিবডির গঠন

Fab অঞ্চলটি উভয় পলিপেপটাইডের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অংশ নিয়ে গঠিত। অ্যান্টিবডির Y যে অংশ দ্বারা অ্যান্টিজেনের সাথে তালাচাবি পদ্ধতিতে সংযুক্ত হয় তাকে প্যারাটোপ (paratope) বলে। প্যারাটোপে

অ্যাসিডের দৈবচয়িত সন্নিবেশন (random arrangement) বা **VDJ** (variable diversity joining) রিকম্বিনেশনের ফলে মানবদেহে প্রায় 100 মিলিয়ন অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হতে পারে।

অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ (Types antibody)

মানুষের রক্ত সিরামে 5 ধরনের অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিন অণু পাওয়া যায়। সাধারণত অ্যান্টিবডির অণুতে বিদ্যমান ভারী শিকলে অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস অনুযায়ী এদের এ ধরন নির্ণয় করা হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসের ভিত্তিতে মানুষের অ্যান্টিবডিতে 5 ধরনের ভারী শিকল পাওয়া যায়। এগুলো হলোঃ γ শিকল (gamma chain), μ শিকল (mu chain), α শিকল (alpha chain), ε শিকল (epsilon chain) ও δ শিকল (delta chain)। এ 5 ধরনের ভারী শিকলের উপর ভিত্তি করে মানবদেহের অনাক্রম্যতন্ত্রের অ্যান্টিবডিগুলো নিম্নবর্ণিত 5 শ্রেণিতে বিভক্ত:

১। **ইমিউনোগ্লোবিন G বা IgG:** এগুলো γ শিকল বিশিষ্ট সাধারণ প্রকৃতির অ্যান্টিবডি। এটি অ্যান্টিবডির সবচেয়ে সমৃদ্ধ শ্রেণি এবং দেহের মোট অ্যান্টিবডির 75% IgG প্রকৃতির যা রক্ত ও লসিকায় অধিক পরিমাণে থাকে। এরা বিভিন্ন অণুজীবের চারদিকে আবরণ তৈরী করে এবং এদের ভক্ষণে প্রতিরক্ষাতন্ত্রের অন্যান্য কোষকে ত্বরান্বিত করে। এরা পরিপাকনালি ও শ্বসননালিকে অণুজীবের আক্রমণ হতে রক্ষা করে। দুধ ও লালারসে ইমিউনোগ্লোবিন G পাওয়া যায়।

২। **ইমিউনোগ্লোবিন M বা IgM:** এগুলো μ শিকল বিশিষ্ট অ্যান্টিবডি যারা B কোষের উপরিতলে যুক্ত থাকে। এরা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অত্যন্ত কার্যকরি। রক্তে বিদ্যমান অ্যান্টিবডির 5-10% IgM প্রকৃতির। লসিকাতেও এ ধরনের অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। প্লাজমা কোষ কর্তৃক নিঃসৃত IgM দেহের সর্ববৃহৎ অ্যান্টিবডি। এদের গ্লোবিউলিন অণু IgG থেকে 5 গুণ বড়।

৩। **ইমিউনোগ্লোবিন A বা IgA:** এগুলো α শিকল বিশিষ্ট অ্যান্টিবডি যা অশ্রু, লালা, পরিপাক রস, শ্বসন তরল, রক্ত, লসিকা প্রভৃতি দেহতরলে বিদ্যমান থেকে জীবাণু প্রবেশকে প্রতিরোধ করে। এরা ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। এটি অ্যান্টিবডির দ্বিতীয় সমৃদ্ধ শ্রেণি এবং দেহের মোট অ্যান্টিবডির 10-15% IgA প্রকৃতির। মানুষের মনোকষ্টের কারণ দেহে IgA মাত্রা কমে গিয়ে সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। মায়ের শালদুধে (colostrum) প্রচুর পরিমাণে IgA পাওয়া যায়। মলের সাথে IgA বের হয়ে যাওয়াকে ক্যাপ্রোঅ্যান্টিবডি (coproantibody) বলে।

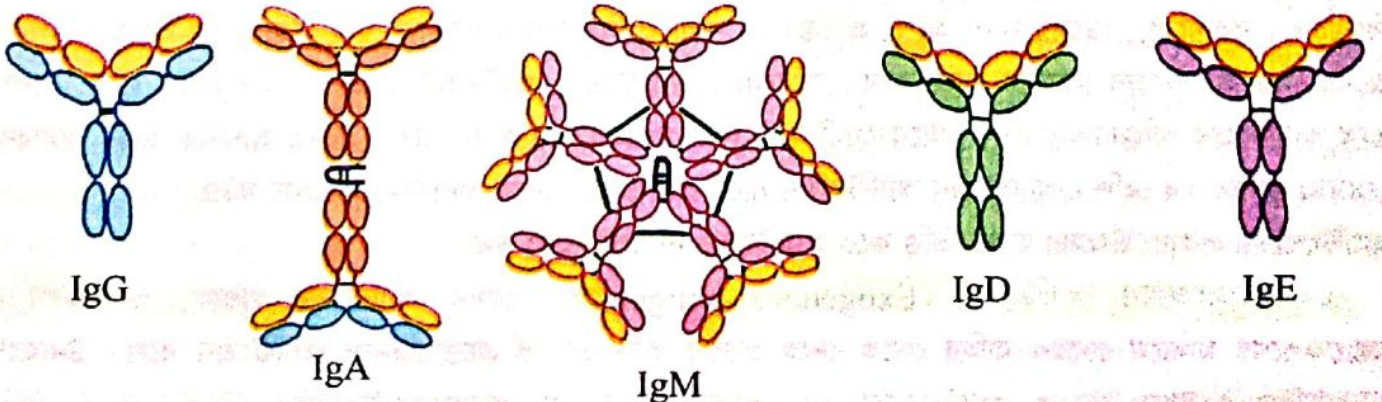

চিত্র ১০.৫ বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি (ইমিউনোগ্লোবিন)

৪। **ইমিউনোগ্লোবিন E বা IgE:** এগুলো ε শিকল বিশিষ্ট দুর্লভ প্রকৃতির (মোট অ্যান্টিবডির 0.1% এর কম) অ্যান্টিবডি যারা মাস্ট কোষ ও বেসোফিল শ্বেতরক্তকণিকায় থাকে। এরা হিস্টামিন ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে প্রদাহজনিত সাড়াদানকে সক্রিয় করে। এরা অ্যালার্জিক ও অতিসংবেদনশীল বিক্রিয়ার সাথে জড়িত এবং পরজীবী কীটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

CamScanner

৫। ইমিউনোগ্লোবিন D বা IgD: এগুলো δ শিকল বিশিষ্ট অ্যান্টিবডি যারা রক্ত, লসিকা ও B কোষের উপরিতলে থাকে এবং B কোষের কাজের সূচনা ঘটায়। দেহের মোট অ্যান্টিবডির মাত্র 0.2% IgD প্রকৃতির।

■ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি (Monoclonal antibodies)

একই মাতৃকোষ হতে সৃষ্ট অভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য অনাক্রম্য কোষ কর্তৃক নিঃসৃত অ্যান্টিবডি যা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির অ্যান্টিজেনের সাথে ক্রিয়া করে তাকে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দেন জর্জ কোহলার (Georges Kohler) এবং সিজার মাইলস্টেইন (Cesar Milstein) নামক দুজন বিজ্ঞানী 1975 সালে। দেহের কোনো অঞ্চলে বিদ্যমান টিউমার কোষ বা প্লাজমা কোষ মনোক্লোনাল প্রকৃতির, কারণ এরা সুনির্দিষ্ট ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম।

মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির ব্যবহার

১। সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণের মাধ্যমে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি অনাক্রম্যতন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

২। অনেক টিউমার সুনির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দেহে টিউমার নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

৩। কিছু মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-সাইটোকাইন টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর (TNF) অনেক জটিল প্রদাহিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

৪। অনেকক্ষেত্রে কোষের পপুলেশন শনাক্তকরণে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে লিম্ফোসাইট ও লিউকোসাইটের বিভেদন নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

৫। কোষের ভবিষ্যত পরিণতি ও কাজের তথ্য তৈরিতে কোষের বিশুদ্ধকরণে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ব্যবহৃত হয়।

অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন (Antigen or Immunogen)

দেহের ভেতরে যেসব পদার্থ বহিরাগত বলে চিহ্নিত হয় এবং যাদের অণুপ্রবেশের ফলে দেহ অনাক্রম্যজনিত সাড়া দেয়, তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন বলে। হাঙ্গেরিয় অণুজীব বিজ্ঞানী লেডিস্লাস ডয়েটস (Ladislas Deutsch) সর্ব প্রথম 1903 সালে অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন। ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন অংশ (আবরণ, ক্যাপস্যুল, কোষপ্রাচীর, ফ্লাজেলা, ফিমব্রি ও নিঃসৃত বিষ), ভাইরাস এবং অন্যান্য অণুজীব অ্যান্টিজেন হিসেবে বিবেচিত। পরাগরেণু, ডিমের সাদা অংশ, প্রতিস্থাপিত কলা ও অঙ্গ কিংবা দানকৃত রক্ত ইত্যাদি অ-অণুজীব উপাদান অনেকসময় অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ অ্যান্টিজেন প্রোটিনধর্মী ও জটিল রাসায়নিক গঠন বিশেষ। তবে অ্যান্টিজেন পলিস্যাকারাইড, গ্লাইকোপ্রোটিন বা নিউক্লিওপ্রোটিনও হতে পারে। এদের আণবিক ওজন সাধারণত 10000 ডাল্টন এর বেশি। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির সাথে আবদ্ধ হয়ে দেহে অনাক্রম্যতা ক্রিয়া ঘটায়।

অ্যান্টিজেনের প্রকার: উৎসের উপর ভিত্তি করে অ্যান্টিজেন দুধরনের হয়, যথা-

১। এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন (Exogenous antigens): যেসব অ্যান্টিজেন প্রশ্বাস, গলাধকরণ বা অন্তঃক্ষেপণের মাধ্যমে দেহের বাহির থেকে দেহে প্রবেশ করে তাদের এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। উদাহরণ- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, কৃমি, ধূলিকণা, খাদ্যকণা, পরাগরেণু ইত্যাদি।

২। এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন (Endogenous antigens): যেসব অ্যান্টিজেন দেহের ভেতরে কোষের বিপাকীয় কার্যাবলি দ্বারা কিংবা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে সৃষ্টি হয় তাদের এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। উদাহরণ- টিউমার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন, প্রোটিন অ্যান্টিজেন, হিস্টোকমপ্যাটিবিলিটি লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন (HLA) ইত্যাদি।

CamScanner

কয়েকটি সাধারণ অ্যান্টিজেন

- **ইপিটোপ** (Epitope): অ্যান্টিজেনধর্মী জটিল প্রোটিনের যে অংশ অনাক্রম্যতন্ত্রের অ্যান্টিবডি বা B কোষ বা T কোষ দ্বারা শনাক্ত হয় তাকে **ইপিটোপ** (epitope) বা **অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিনেট** (antigenic determinant) বলে। একটি অ্যান্টিজেনধর্মী প্রোটিনের একাধিক ইপিটোপ থাকতে পারে।
- **হ্যাপ্টেন** (Haptens): অনেকসময় বিশেষ ক্ষুদ্র রাসায়নিক অণু নিজে অ্যান্টিজেন না হলেও কোনো বৃহৎ প্রোটিন বা বৃহৎ কোনো অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেনধর্মী হয়ে পড়ে এবং অ্যান্টিবডির সাথে আবদ্ধ হয়। এসব পদার্থকে **হ্যাপ্টেন** (hapten) বলে। হ্যাপ্টেনগুলো বিশেষ প্রোটিনের উপর ইপিটোপ হিসেবে কাজ করে।
- **অ্যালারজেন** (Allergen): অনেকসময় দেখা যায় যে অক্ষতিকর কিছু বস্তু যেমন- ধুলোবালি, পরাগরেণু কিংবা বিড়ালের লোম ইত্যাদির উপস্থিতিতে অনাক্রম্যতন্ত্র অস্বাভাবিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে। ফলে অ্যালার্জি সৃষ্টি হয়। এগুলো অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে এবং এদের **অ্যালারজেন** (allergen) বলে।
- **সুপারঅ্যান্টিজেন** (Superantigen): যেসব অ্যান্টিজেন T কোষের নন-স্পেসিফিক ধরনের সক্রিয়করণ করে বিপুল পরিমাণ সাইটোকাইন নিঃসরণ ঘটায় তাদের **সুপারঅ্যান্টিজেন** বলে।
- **টলারোজেন** (Tolerogen): যেসব অ্যান্টিজেনিক বস্তু তাদের আণবিক গঠনের কারণে কোনো সুনির্দিষ্ট অনাক্রম্যতন্ত্রকে সাড়া না দেয়ায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের **টলারোজেন** বলে।
- **T-নির্ভর অ্যান্টিজেন** (T-dependent antigen): যেসব অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি উৎপাদনে B লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করতে helper T কোষের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় তাদের **T-নির্ভর অ্যান্টিজেন** বলে।
- **T-স্বাধীন অ্যান্টিজেন** (T-independent antigen): যেসব অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি উৎপাদনে B লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করতে helper T কোষের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না তাদের **T-স্বাধীন অ্যান্টিজেন** বলে।
- **অনাক্রম্যপ্রকট অ্যান্টিজেন** (Immunodominant antigens): অনাক্রম্যতায় সাড়াদানের ক্ষেত্রে যেসব অ্যান্টিজেন অন্য সকল অ্যান্টিজেন কিংবা সংক্রমক হতে প্রকট তাদের **অনাক্রম্যপ্রকট অ্যন্টিজেন** বলে।

স্বজাতীয় ও বিজাতীয় (Self and nonself)

মানব অনাক্রম্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি দেহের নিজস্ব অণু বা কোষ এবং বহিরাগত কোনো অণু বা জীবাণু বা পরজীবীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। দেহে বিদ্যমান নিজস্ব অণু বা কোষসমূহকে **স্বজাতীয় (self)** এবং বহিরাগত কোনো অণু বা জীবাণু বা পরজীবীকে **বিজাতীয় (nonself)** বলে। দেহের অনাক্রম্যতন্ত্র স্বজাতীয়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে। কিন্তু দেহাভ্যন্তরে যখন কোনো বিজাতীয় প্রবেশ করে তখনই তার বিরুদ্ধে ক্রিয়া শুরু করে। বিজাতীয় যেসব বস্তু দেহে প্রবেশের পর দেহের অনাক্রম্যতন্ত্র সাড়া প্রদান শুরু করে তাদের **অ্যান্টিজেন** (antigen) বলে। এগুলো বিভিন্ন জীবাণু, ভাইরাস কিংবা ভাইরাসের অংশ হতে পারে। অভিন্ন যমজ (identical twin) ব্যতিত অন্য মানুষের দেহের কোনো কলা বা কোষ বিজাতীয় হতে পারে এবং এগুলো অ্যান্টিজেনরূপে কাজ করে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনাক্রম্য ব্যবস্থা স্বজাতীয়কে বিজাতীয় হিসেবে শনাক্ত করে এবং এদের আক্রমণ করে। এর ফলে দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাকে **অটোইমিউন রোগ** (autoimmune diseases) বলে। আর্থ্রাইটিস এবং ডায়াবেটিস-এর কিছু ধরন এ জাতীয় রোগ।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া (Antigen-antibody reaction)

রক্তের B লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি সৃষ্টির মাধ্যমে দেহের হিউমোরাল বা রক্তনির্ভর অনাক্রম্যতা সংঘটিত হয়। দেহে অ্যান্টিবডি বিভিন্ন উপায়ে কাজ করে, যেমন-

(ক) কিছু অ্যান্টিবডি সংক্রমকের (pathogens) বহিঃতলে বিদ্যমান অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত হয়। ফলে সংক্রমক পোষক কোষের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

(খ) অনেক অ্যান্টিবডি সংক্রমকের সাথে আবদ্ধ হয়ে যায়। অ্যান্টিবডিযুক্ত এসব সংক্রমককে ফ্যাগোসাইট কোষ ভক্ষণ করে জীবাণুর আক্রমণ রোধ করে।

CamScanner

(গ) কিছু অ্যান্টিবডি দেহের কমপ্লিমেন্টতন্ত্রকে সক্রিয় করে যা সংক্রমক বা জীবাণুকে ধ্বংস করে।

যে বিক্রিয়ায় জীবাণুর গায়ে বিদ্যমান কোনো অ্যান্টিজেন অনাক্রম্যতন্ত্রে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট অ্যান্টিবডির সাথে আবদ্ধ হয়ে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স (antigen-antibody complex) গঠন করে তাকে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া বলে। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া অনেকটা তালা-চাবি পদ্ধতিতে কাজ করে। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স গঠন মানব অনাক্রম্যতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ প্রক্রিয়া।

হিউমোরাল বা রক্তনির্ভর অনাক্রম্যতায় অ্যান্টিবডির মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধের মূলে থাকে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া। B লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি ক্ষরণ অনাক্রম্যতাজনিত সাড়াদানের যেমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তেমনি অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবাণু বা ভাইরাস আক্রমণ প্রতিরোধ করা অন্য একটি বিশিষ্ট দিক।

ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীবাণু কোনো কোষকে আক্রমণের পূর্বে উহারা পোষক কোষের প্লাজমাপর্দার উপর আবদ্ধ হয়। অশ্রু, নাকের পানি, লালারস ও অন্যান্য দেহতরলে অ্যান্টিবডি IgA থাকে এবং উহা সংক্রামক জীবাণুর গায়ে যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সাথে আবদ্ধ হয়। এর ফলে অ্যান্টিবডি আবৃত সকল জীবাণু সফলভাবে পোষক কলার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।

যেসব জীবাণু IgA এর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কলার ভেতরে প্রবেশ করে উহারা লিম্ফনোড ও মিউকোসা কলায় বিদ্যমান IgE এর সংস্পর্শে আসে। IgE মাস্ট কোষের সাথে আবদ্ধ হয়ে উহা হতে হিস্টামিন ক্ষরণ করায়। হিস্টামিনের প্রভাবে স্থানিক ভিত্তিতে প্রদাহিক বিক্রিয়া শুরু হয়। এ অবস্থায় ক্ষতস্থানে প্রচুর পরিমাণ IgG সরবরাহ হয় এবং একইসাথে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমও কাজ করে। ক্ষতস্থানের প্রদাহের ফলে অনাক্রম্যতন্ত্রে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স গঠিত হয়।

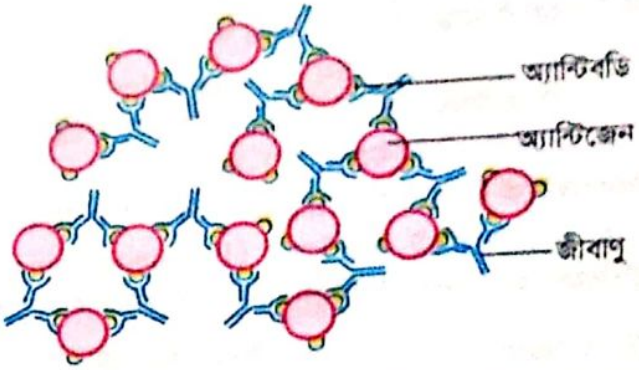

চিত্র ১০.৬ অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স

অ্যান্টিজেন পোষক কলার ভেতরে প্রবেশ করলে রক্তের B লিম্ফোসাইট উহার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি ক্ষরণ শুরু করে। অ্যান্টিবডিসমূহ সর্বদা Y আকৃতির গঠন বিশিষ্ট হয়। এরা (অ্যান্টিবডি) যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকের মতো সর্বদা শত্রুর (অ্যান্টিজেন) বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। প্রতিটি অ্যান্টিবডির প্যারাটোপ (paratope) নামক অনন্য বন্ধন স্থান থাকে যা অ্যান্টিজেনের বিশেষ বন্ধন স্থান ইপিটোপ (epitope)-এর সাথে যুক্ত হয়। অ্যান্টিজেনের ইপিটোপের সাথে অ্যান্টিবডির প্যারাটোপ তালা-চাবির মতো যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স (Ag-Ab complex) গঠন করে। অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে তথা জীবাণুকে ধ্বংস করে যা ম্যাক্রোফেজ কর্তক ভক্ষিত হয়।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন-

(Agglutination): ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুর গায়ে যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সাথে অ্যান্টিবডি অণু আবদ্ধ হলে একত্রে একাধিক জীবাণু সংঘবদ্ধ হয়। এর ফলে মণ্ডের মতো একটি বড় আকারের জোট সৃষ্টি হয়। এমন ঘটনাকে অ্যাগ্লুটিনেশন (agglutination) বলে। এ বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য IgM বিশেষ কার্যকরি, তবে IgG দ্বারা মৃদু বিক্রিয়া ঘটতে পারে।

(Opsonization): যে অ্যান্টিবডি দ্বারা কোনো অ্যান্টিজেনকে ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য সংবেদনশীল করা হয় তাকে অপসোনিন (opsonin) বলে। কিছু অ্যান্টিজেন বিভিন্ন উপায়ে ফ্যাগোসাইটিক ক্রিয়াকে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু যখন কোনো অ্যন্টিবডি কোনো অ্যান্টিজেনের সাথে আবদ্ধ হয় তখন সংশ্লিষ্ট জীবাণু ফ্যাগোসাইটিক ক্রিয়ায় সংবেদনশীল হয়। অনাক্রম্যতন্ত্রে এ পদ্ধতিকে অপসোনাইজেশন বলে। এর ফলে অ্যান্টিবডি দ্বারা আচ্ছাদিত যে কোনো জীবাণু বা অ্যান্টিজেন খুব সহজেই ফ্যাগোসাইট কর্তৃক ভক্ষিত হয়।

CamScanner

৩। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সক্রিয়তা (Activation of complement system): অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন বন্ধন দেহের সকল সংক্রমককে বিতারণ করতে যথেষ্ট নয়। ফলে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করে এবং সংক্রমকের সাথে সংশ্লিষ্ট করে। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম উদ্বুদ্ধ হলে উহার প্রোটিন উপাদানসমূহ সংক্রামক জীবাণুকে ধ্বংস অথবা নিষ্ক্রিয় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৪। কোষ বিদারণ (Lysis): সক্রিয় কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম আক্রান্ত কোষকে বিদীর্ণ করে নষ্ট করতে পারে। অনেকসময় IgM অ্যান্টিবডি নিজেই কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সাহায্য ব্যতিরেকে আক্রান্ত কোষকে বিদীর্ণ করে নষ্ট করতে পারে।

৫। প্রশমন (Neutralization): অনেকক্ষেত্রে রোগজীবাণু বিষাক্ত টক্সিন ক্ষরণ করে পোষকের ক্ষতি করে। এসব বিষাক্ত টক্সিন অ্যান্টিজেনরূপে চিহ্নিত হয় এবং অ্যান্টিবডির সাথে আবদ্ধ হয়ে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স গঠন করে। এতে টক্সিনের বিষক্রিয়া প্রশমিত হয়। IgG ব্যাকটেরিয়াজাত টক্সিন প্রশমনে বিশেষ উপযোগী।

অনাক্রম্যতায় সাড়াদানের প্রকৃতি (Nature of immune response)

অনাক্রম্যতায় সাড়া দিতে পারে এমন প্রাণিদেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করালে রক্তে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হতে 3-14 দিন সময় লাগে। অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শের প্রতি প্রথম অনাক্রম্য সাড়াদানকে মুখ্য বা প্রাথমিক সাড়া (primary response) বলে। দেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করানোর পর খুব অল্প সময়ের একটি সুপ্ত দশা (latent period) দেখা যায়।

এসময় অ্যান্টিজেনের শনাক্তকরণ ঘটে। যার ফলে লিম্ফোসাইটেরে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় একটি লগারিদমিক দশা (logarithmic phase) দেখা যায় যখন দেহে অ্যান্টিবডির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি চরম অবস্থায় পৌছায়। অবশেষে শুরু হয় পতন দশা (decline phase) যখন অ্যান্টিবডির মাত্রা কমতে কমতে স্বল্প মাত্রায় উপনীত হয়। যদি ঐ প্রাণীটিতে একই অ্যান্টিজেন আবার দেয়া হয় (এমনকি অনেক বছর পরেও) তাহলে দ্বিতীয় অনাক্রম্য সাড়াদানকে গৌণ সাড়া (secondary response) বলে। এসময় খুবই অল্প সময় সুপ্ত দশার পর পরই খুব দ্রুত অ্যান্টিবডি ও B লিম্ফোসাইট সৃষ্টি হতে পারে। এসময় প্রাথমিক সাড়ার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রার অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। গৌণ সাড়ার সময় পতন দশাও স্তিমিত হয়। গৌণ সাড়ার ক্ষেত্রে প্রধান অ্যান্টিবডি IgG সৃষ্টি হয়।

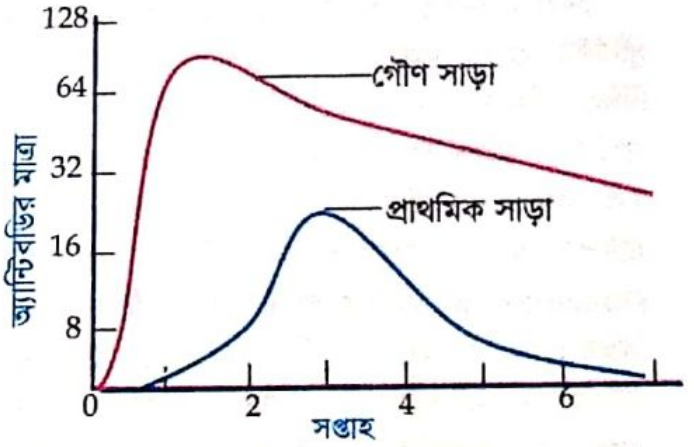

চিত্র ১০.৭ অনাক্রম্যতার সাড়ার ধরন

টিকা বা ভ্যাক্সিনের বুস্টার ডোজগুলো গৌণ সাড়া জাগানোর জন্যই দেয়া হয়। প্রাথমিক সাড়ায় যে স্মৃতিকোষ (memory cell) সৃষ্টি হয় তারাই গৌণ সাড়া সৃষ্টি করে।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়াজনিত সমস্যা

১। এইডস (AIDS) এর কারণে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না।

২। দেহ কখনো কখনো নিজের দেহকোষের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। তখন অটোইমিউন রোগ (autoimmune diseases) সৃষ্টি হয়।

৩। দেহে অনেকসময় অ্যান্টিজেন নয় এমন বস্তুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে। তখন অ্যালার্জি (allergies) দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ হিস্টামিন (histamine) জাতীয় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়।

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে পার্থক্য

অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি
১। অ্যান্টিজেন হলো দেহে প্রবেশকৃত বহিরাগত বস্তু (সংক্রমক বা বিষ) যার বিরুদ্ধে দেহের অনাক্রম্যতন্ত্র অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে।	২। অ্যান্টিবডি হলো বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা কোনো বহিরাগত ক্ষতিকর বস্তু (অ্যান্টিজেন) দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে দেহের অনাক্রম্যতন্ত্র কর্তৃক উৎপাদিত হয়।
২। অ্যান্টিজেন রাসায়নিকভাবে প্রোটিন বা লিপিড বা পলিস্যাকারাইড ধরনের।	২। অ্যান্টিবডি রাসায়নিকভাবে কেবল জৈব প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
৩। অনেকসময় কোনো কোষ অ্যান্টিজেন হতে পারে।	৩। কোনো কোষ কখনোই অ্যান্টিবডি হতে পারে না।
৪। অ্যান্টিজেন স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ধরনের হয়ে থাকে।	৪। অ্যান্টিবডি IgA, IgE, IgG, IgM ও IgD ধরনের হয়ে থাকে।
৫। অনাক্রম্যতন্ত্রে অ্যান্টিজেন চাবি হিসেবে কাজ করে।	৫। অনাক্রম্যতন্ত্রে অ্যান্টিবডি তালা হিসেবে কাজ করে।
৬। দেহের প্রায় সকল কোষের বহিঃতলে অ্যান্টিজেন বিদ্যমান থাকে।	৬। দেহের বিভিন্ন কলা, অঙ্গ ও তন্ত্রে অ্যান্টিবডি বিদ্যমান থাকে।

১০.৬ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা (Role of Vaccine in Immunity)

টিকা বা ভ্যাক্সিন হলো কোনো জীবিত, মৃত বা অর্ধমৃত অণুজীব বা অণুজীবঘটিত পদার্থ যা শরীরে ঢুকিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে অনাক্রম্যতা জাগানো হয়। টিকা বা ভ্যাক্সিন হলো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের নিষ্ক্রিয় পরিস্রুত সাসপেনশন। টিকায় ব্যবহৃত অণুজীবদের এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয় যাতে এরা জীবকোষে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। অ্যান্টিবডি রোগের জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিহত করে এবং স্থায়ীভাবে কার্যক্ষমতা নষ্ট করে। অধিকাংশক্ষেত্রে ভাইরাস থেকে টিকা তৈরি করা হয়। সাধারণত কোনো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দিয়েই ঐ রোগের টিকা তৈরি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্য দেহে টিকা দেয়া **(inoculation)** মানে হলো ঐ রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করানো। কিন্তু যেহেতু এ জীবাণুগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় থাকে, সেহেতু এরা জীবদেহে কোনো রোগ সৃষ্টি না করে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। টিকা দেহের অনাক্রম্যতন্ত্রকে রোগ-প্রতিরোধে বিশেষ শিক্ষা দেয়। ড. এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Jenner) 1796 সালে সর্বপ্রথম ভ্যাক্সিন শব্দটি ব্যবহার করেন (Latin *vacca*, cow) এবং গো বসন্তের (cow pox) ভাইরাস থেকে মানুষের গুটি বসন্তের টিকা (smallpox vaccine) আবিষ্কার করেন। এর অনেকবছর পর লুই পাস্তর (Louis Pasteur) 1885 সালে জলাতঙ্ক রোগের টিকা (hydrophobia vaccine) আবিষ্কার করেন। মরণ ব্যাধি এইডস (AIDS)-এর ভাইরাস HIV কিংবা হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের প্রতিষেধক কোনো টিকা আজও আবিষ্কার হয়নি।

একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য

১। সাড়াজীবনের জন্য দেহকে অনাক্রম্য করে।
২। সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়।
৩। রোগের সংক্রমণ রোধ করে।
৪। খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা ঘটায়।
৫। মায়ের অনাক্রম্যতাকে সন্তানে সঞ্চারিত করে।
৬। সুস্থিত, সস্তা এবং নিরাপদ।

Dr. Edward Jenner
(1749-1823)

Louis Pasteur
(1822-1895)

টিকার প্রকারভেদ

মানবদেহের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে দমন করতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পাঁচ ধরনের টিকা আবিষ্কার করেছেন। এগুলো হলো:

১। মৃত বা নিষ্ক্রিয় টিকা (Killed or inactivated vaccine): রোগের শক্তিশালি জীবাণুকে তাপ বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা মেরে (killed) বা নিষ্ক্রিয় করে (inactivated) এসব টিকা তৈরি করা হয়। যেমন- *ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, পোলিও, হেপাটাইটিস A, র‍্যাবিস* ইত্যাদি টিকা।

২। জীবন্মৃত জীবন্ত টিকা (Attenuated live vaccine): আবাদ মাধ্যমে শক্তিশালি জীবাণু পালন করে তাদের নিষ্ক্রিয় করে জীবন্মৃত (attenuated) করা হয়। এর ফলে জীবাণুগুলোর তেমন সংক্রমণ ক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় নিষ্ক্রিয়কৃত জীবন্মৃত জীবাণুকে ভ্যাক্সিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- *হাম, মাম্পস, রুবেলা, পানি বসন্ত, টাইফয়েড* প্রভৃতি রোগের টিকা।

৩। বিষভিত্তিক টিকা (Toxoid vaccine): কয়েকটি রোগ জীবাণু কর্তৃক নিঃসৃত বিষাক্ত টক্সিনের কারণে হয়ে থাকে। এসব বিষাক্ত টক্সিন প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। এসব বিষাক্ত পদার্থকে ফরমালডিহাইড প্রয়োগে নিষ্ক্রিয় করে ভ্যাক্সিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- *ডিপথেরিয়া, টিটেনাস* (ধনুষ্টংকার) প্রভৃতি রোগের টিকা।

৪। উপএকক টিকা (Subunit vaccine): জীবাণুর যে অংশের কারণে দেহ অনাক্রম্যতায় সাড়াদান করে কেবল সে অংশ দ্বারা উপএকক টিকা তৈরি করা হয়। জীবাণুর সাড়াদানকারী অংশকে অ্যান্টিজেন বলে। উপএকক টিকায় 1-20 টি অ্যান্টিজেন থাকে। এ টিকা তৈরিতে যেহেতু জীবাণুর সুনির্দিষ্ট, প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহার করা হয় সেহেতু এর প্রতিকূলীয় ঝুঁকি কম থাকে। উদাহরণ- *হিউমেন প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাক্সিন, হেপাটাইটিস-B ভ্যাক্সিন* ইত্যাদি। (হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের HBsAg অ্যান্টিজেন থেকে হেপাটাইটিস-B ভ্যাক্সিন তৈরি করা হয়)।

৫। অনুবন্ধী টিকা (Conjugate vaccine): দুটি ভিন্ন ধরনের উপাদান, যেমন একটি দুর্বল অ্যান্টিজেন ও একটি শক্তিশালি অ্যান্টিজেন নিয়ে অনুবন্ধী টিকা তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার পলিস্যাকারাইড ক্যাপস্যুলের সাথে একটি প্রোটিন যুক্ত করে টিকা তৈরি করা হয় যা দেহের অনাক্রম্যতাকে সমৃদ্ধ করে। উদাহরণ-হিমোফিলাস *ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা, নিউমোকক্কাল টিকা* ইত্যাদি।

টিকা তৈরির কৌশল

আক্রমণকারী বা রোগ প্রতিরোধকারী অণুজীবকে কোনো নির্ধারিত জীবকোষে আবাদ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কালচারকৃত এসব অণুজীবকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর অণুজীবগুলোকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় বা নিষ্প্রাণ করে টিকা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন প্রকার টিকা বিভিন্ন উৎস থেকে তৈরি করা হয়। অনেকসময় জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় জিন ক্লোনিং করে অথবা জিন সংশ্লেষ করে টিকা তৈরি করা হয়। টাইফয়েড জ্বরের টিকা *Salmonella typhi* নামক ব্যাকটেরিয়ার মৃতকোষ দিয়ে তৈরি করা হয়। র‍্যাবিস রোগের টিকা *Rabies* ভাইরাসের অর্ধমৃত দেহ হতে তৈরি করা হয়। গুটি বসন্তের জীবাণু *Variola* ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য *Vaccina* ভাইরাস দিয়ে তৈরি টিকা প্রদান করা হয়। আধুনিক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে পোলিও, টিটেনাস, হাম, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, হুপিং কাশি, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-B ইত্যাদি রোগের টিকা তৈরি করা হয়। ডিপথেরিয়ার টিকা জিন সংশ্লেষের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

টিকাদান বা ভ্যাক্সিনেশনের নীতি (Principles of Vaccination)

সংক্রমকের বিরুদ্ধে অর্জিত অনাক্রম্যতা বিকাশের জন্য মানবদেহে কোনো অ্যান্টিজেনিক বস্তু অর্থাৎ ভ্যাক্সিন বা টিকা দেয়ার পদ্ধতিতে টিকাদান বা ভ্যাক্সিনেশন (vaccination) বলে। টিকাদানের মূল উদ্দেশ্য হলো দেহের অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করা। কোনো জীবাণু বা সংক্রমক যখন দেহে প্রবেশ করে তখন দেহের ইমিউনতন্ত্র উদ্দীপিত হয় এবং অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে। কিন্তু জীবাণু বা সংক্রমকের আক্রমণে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে টিকাদান

আর কোনো কাজে আসে না। এসব দিক বিবেচনা করে টিকাদান কতগুলো নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টিকাদানের নীতিগুলো হলো:

১। ভ্যাক্সিন বা টিকা মৃত বা নির্জীব জীবাণু অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় উপজাত সমন্বয়ে গঠিত।

২। নির্জীব জীবাণু ভ্যাক্সিন হিসেবে শরীরে প্রবেশ করানো হলে উহা বংশবৃদ্ধি করলেও কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। নিষ্ক্রিয় টক্সয়েড টিকা হিসেবে ব্যবহৃত হলে উহা শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৩। টিকা প্রয়োগে যে অনাক্রম্যতা জাগে তা জীবনব্যাপী স্থায়িত্ব পায় না। তবে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ দ্বারা এর স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তোলা যায়। বুস্টার ডোজগুলো দীর্ঘস্থায়ী অনাক্রম্যতা বজায় রাখে।

৪। কোন পথে টিকা প্রয়োগ হচ্ছে তার উপর অনেকসময় অনাক্রম্যতা স্থায়ী হয়। যেমন, খাদ্যনালি সংক্রমণের ক্ষেত্রে খাদ্যনালির মাধ্যমে টিকা প্রযোগ করলে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়।

৫। অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগাতে যে সময় লাগে তা কোনো জীবাণুর সুপ্তিকালীন সময়ের (incubation period) চাইতে অনেক বেশি। এ কারণে দেহে রোগ জীবাণু সংক্রমণের পর টিকা প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে জলাতঙ্ক রোগের ক্ষেত্রে টিকা প্রয়োগে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কারণ জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাসের (Rabies virus) বেলায় সুপ্তিকালীন সময় অতিশয় দীর্ঘ।

জাতীয় টিকাদান কর্মসূচী (National vaccination programme)

রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টিকাদান বা ভ্যাক্সিনেশন সর্বোত্তম স্বাস্থ্য পরিসেবা বলে বিবেচিত। যেহেতু প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে অনাক্রম্যতা দেখা যায়, সে কারণে অনাক্রম্যতাকে সক্রিয় রাখার কৌশলই মানুষকে অনেক রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারে। বিশেষত যেসব রোগের কারণ কোনো না কোনো অণুজীব এবং যেসব রোগ ছোঁয়াচে ও মহামারিরূপে মানবসমাজে বিস্তার লাভ করে তাদের দমন বা রোধ করতে টিকাদানের কোনো বিকল্প নেই। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত অনাক্রম্যতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। মানুষের ছয়টি রোগের টিকা এখন সহজ প্রাপ্য। এগুলো হলো: ডিপথেরিয়া (Diphtheria), হুপিংকাশি (Pertussis), ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus), পোলিও (Polio), হাম (Measles) ও যক্ষ্মা (Tuberculosis)।

১। **পোলিও টিকা** (Polio vaccine): পোলিও বা পোলিওমাইলিটিস (Polio or Poliomyelitis) একটি ভাইরাসঘটিত মারাত্মক সংক্রমক রোগ। *Enterovirus* নামক একটি RNA ভাইরাসের কারণে এরোগ সৃষ্টি হয় যার কারণে শিশুরা পঙ্গু হয়ে যায়। এরোগ প্রতিরোধে পাঁচ বছরের নিচের সকল শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়। পোলিও রোগের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মুখে খাওয়ার পোলিও টিকা ব্যবহার করা হয়। পোলিও রোগ দূরীকরণের জন্য 1988 সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এক কর্মসূচীতে সারা পৃথিবীতে পোলিও রোগ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব এখন 99% পোলিও মুক্ত। বাংলাদেশে 1995 সাল থেকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং 2006 সাল থেকে বাংলাদেশ অনেকটা পোলিওমুক্ত।

২। **ডিপিটি টিকা** (DPT vaccine): ডিপথেরিয়া (Diphtheria), হুপিংকাশি (Pertussis) এবং ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) এ তিনটি রোগের জন্য ডিপিটি টিকা দেয়া হয়। ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কার রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া (যথাক্রমে- *Corynebacterium diphtheriae* ও *Clostridium tetani*) নিঃসৃত টক্সিন এবং হুপিংকাশির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার (*Bordetella pertussis*) কোষকে একত্রে নিষ্ক্রিয় করে এ টিকা তৈরি করা হয়।

৩। **বিসিজি টিকা** (BCG vaccine): মানুষের যক্ষ্মা রোগের জীবাণুর (*Mycobacterium tuberculosis*) বিরুদ্ধে এ টিকা ব্যবহৃত হয়। বোভিন (গরু জাতীয় প্রাণী) এর দেহে যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়াকে (*Mycobacterium bovis*) জীবন্মৃত করে এ টিকা তৈরি করা হয়। বেসিলাস (*Bacillus*) ব্যাকটেরিয়া, এ জীবাণুর আবিষ্কারক ফরাসি বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ক্যালমিটি (Albert Calmette) এবং ক্যামিলি গুরিন (Camille Guerin) এর নামানুসারে টিকার নাম বিসিজি (BCG=Bacillus Calmette Guérin) করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) শিশুদের অণুজীবঘটিত ছয়টি রোগের (ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও, হাম ও যক্ষ্মা) বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং গত 20 বছরে অনেকক্ষেত্রে এর ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) কর্তৃক বাস্তবায়িত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইপিআই কর্মসূচীর (Expanded Program on Immunization-EPI) মাধ্যমে এ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

যদি জন্মের পর থেকে শিশুকে পরিকল্পনা মাফিক টিকাদানের আওতায় আনা যায় তাহলে এরা এসব দুরারোগ্য ব্যাধি হতে রক্ষা পাবে। সমাজের প্রতিটি শিশুকে যদি টিকাদানের আওতায় আনা যায় তবে সমাজজীবনেও এসব রোগ আর মহামারির কারণ হয়ে উঠবে না। এ কারণে জাতীয় স্তরে 1979 সাল থেকে সরকারী উদ্যোগে পরিকল্পনা মাফিক ইপিআই কর্মসূচীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

টিকাদানের ইপিআই কর্মসূচীতে নিম্নের ছক অনুযায়ী টিকা দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে:

বয়সকাল	সুপারিশকৃত টিকা
জন্মের এক মাসের মধ্যে	BCG ও OPV-O
6 সপ্তাহ বয়সে	DPT-I ও OPV-I
10 সপ্তাহ বয়সে	DPT- II ও OPV- II
14 সপ্তাহ বয়সে	DPT-III ও OPV-III
9 মাস বয়সে	Measles vaccine
18 মাস বয়সে	DPT ও OPV (Booster dose)
5-6 বছর	DT vaccine
10-16 বছর	TT vaccine

OPV= Oral Polio Vaccine
BCG = Bacille Calmette Guerin
DPT= Diphtheria, Pertussis, Tetanus
DT= Diphtheria and Tetanus
TT= Tetanus Toxoid
OPV-O=Zero dose
OPV-I=1st dose
BCG-I=1st dose

১০.৭ অনাক্রম্যতায় মেমোরি কোষের ভূমিকা
(The roles of memory cells in immunity)

মেমোরি কোষ (memory cells) হলো কতগুলো বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে। এরা মানবদেহে রোগ ও সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে দেহের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এগুলো মানুষের অস্থি মজ্জা থেকে সৃষ্টি হয়। মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্রে প্রধানত দুধরনের মেমোরি কোষ থাকে, যথা- মেমোরি T কোষ এবং মেমোরি B কোষ। মেমরি T কোষ অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে। অন্যদিকে মেমোরি B কোষ অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে।

কোনো জীবাণু দ্বারা দেহ প্রথমবার আক্রান্ত হলে B লিম্ফোসাইট কোষ বিভাজিত হয়ে গৌণভাবে মেমোরি B কোষ উৎপন্ন হয়। এগুলো দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট কোষ, ফলে ঐ ধরনের জীবাণুকে দীর্ঘদিন স্মরণ রাখতে পারে। অনুরূপভাবে T লিম্ফোসাইট কোষ বিভাজিত হয়ে গৌণভাবে মেমোরি T কোষ উৎপন্ন হয়। এগুলো মেমোরি B কোষ হতেও অধিক দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট কোষ। একই ধরনের জীবাণু দ্বারা দেহ দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে পূর্বে সৃষ্ট মেমোরি কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হয় এবং দেহের অনাক্রম্যতন্ত্রকে অতি দ্রুত সক্রিয় করে তোলে। কখনো কখনো এরা দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই জীবাণুর বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং জীবাণুকে ধ্বংস করে। এভাবে দেহে স্থায়ী অনাক্রম্যতার সৃষ্টি হয়।

মানবদেহের অর্জিত অনাক্রম্যতা মেমোরি কোষের দ্বারা সৃষ্ট হয় এমনকি টিকার কার্যকারিতাও মেমোরি কোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবদেহের স্থায়ী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণকে সুরক্ষা প্রদান এবং শিশুকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষার ক্ষেত্রে মেমোরি কোষের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ভ্রূণ ও শিশু মায়ের দেহ হতে পরোক্ষভাবে মেমোরি কোষ পেয়ে থাকে। মেমোরি কোষগুলো দ্রুত জীবাণুর অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া প্রদান করে। এরা অতি দ্রুত অসংখ্য প্লাজমা কোষ

তৈরি করে যারা জীবাণু ধ্বংসে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে। মেমরি কোষ কীভাবে কাজ করে তা নিচে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো:

১। B কোষ জীবাণুর দেহে অ্যান্টিজেন খুজে পায় যার সাথে এর অ্যান্টিবডি ম্যাচ করে।

২। সাহায্যকারী T কোষ দ্বারা সক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত এটি অপক্ষো করে।

৩। এরপর B কোষ বিভাজিত হয়ে প্লাজমাকোষ ও মেমরি কোষে সৃষ্টি করে।

৪। প্লাজমাকোষ অসংখ্য অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে যেগুলো জীবাণুর দেহে সংযুক্ত হয়।

৫। রক্তের ম্যাক্রোফেজ অ্যান্টিবডিযুক্ত জীবাণুকে ভক্ষণ করে।

৬। একই ধরনের জীবাণু দ্বারা দেহ পুনরায় আক্রান্ত হলে মেমরি কোষগুলো দ্রুত অনাক্রমতায় সাড়া দেয়।

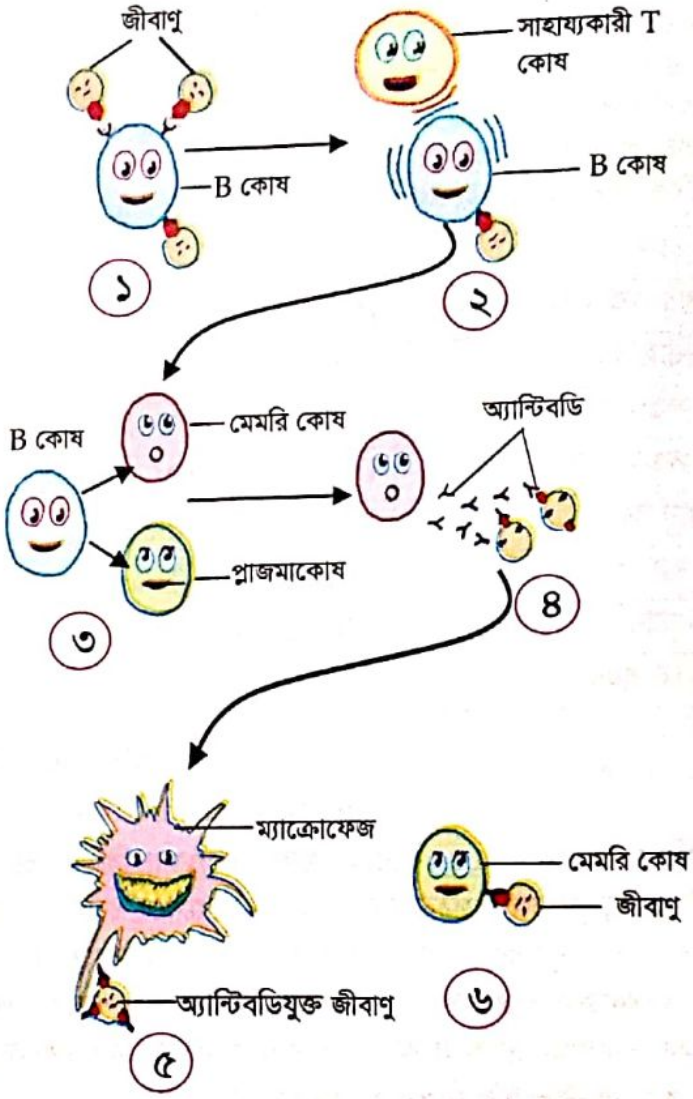

কয়েকটি পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা

১। **ব্যাকটেরিয়া:** শরীরে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় পরজীবী সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে প্লাজমা কোষ নিঃসৃত অ্যান্টিবডি। তবে অধিকাংশক্ষেত্রে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া কোষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

২। **ভাইরাস:** ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কোষ নির্ভর (cell mediated) অনাক্রম্যতাই বেশি কার্যকর। সাধারণত T কোষ ও প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ (NK cell) সংক্রামক ভাইরাসকে নষ্ট করে। তবে অনেকসময় অ্যান্টিবডি দ্বারা কিংবা ইন্টারফেরন সৃষ্টি করে পোষক ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

৩। **ছত্রাক:** ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রধানত কোষ নির্ভর অনাক্রম্যতাই বেশি কাজে লাগে। তবে অ্যান্টিবডি IgA দ্বারা ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিহত হতে পারে।

৪। **প্রোটোজোয়া ও কৃমি:** মানবদেহে প্রোটোজোয়া বা কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধ খুব সহজ কাজ নয়। তবে সাধারণভাবে এসব পরজীবী প্রতিরোধ কোষ নির্ভর অনাক্রম্যতাই বেশি কাজ করে। ঘাতক T কোষের ক্রিয়া এ জাতীয়

পরজীবীর উপর কাজ করে না বললেই চলে। তবে কিছু T কোষ সাইটোকাইন ক্ষরণ করে ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করতে পারে। ম্যাক্রোফেজ ম্যালেরিয়া জীবাণু ও কতিপয় কৃমির আক্রমণ ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। তবে অনেকক্ষেত্রে প্রোটোজোয়া ও কৃমি জাতীয় পরজীবীরা বিশেষ ক্ষমতাবলে অনাক্রম্যতা সাড়া প্রতিহত করতে সক্ষম। কোনো কোনো পরজীবী বিষাক্ত টক্সিন ক্ষরণ করে ম্যাক্রাফেজকে নষ্ট করে। এছাড়া এ ধরনের টক্সিন IgG বা অপর দ্রবণীয় অ্যান্টিবডিকেও নষ্ট করে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

- ❑ ইমিউনোলজি : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি বলে।
- ❑ কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র : কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র হলো মানবদেহের অনাক্রম্যতন্ত্রে বিদ্যমান জৈবরাসায়নিক পদার্থের সমাহার যা দেহ হতে সংক্রমক নির্মূল করে এবং ক্ষয়পূরণ ত্বরান্বিত করে।
- ❑ সাইটোকাইনস : যেসব বিশেষ ধরনের প্রোটিন ধর্মী রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষসমূহ একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সাইটোকাইনস বলে।
- ❑ ফ্যাগোসাইটস : দেহের কিছু কোষ বিভিন্ন অণুজীব ও ভাইরাসকে ভক্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করে। এদের ফ্যাগোসাইটস বলে। যে প্রক্রিয়ায় শ্বেত রক্তকণিকাসমূহ অণুজীব ভক্ষণ করে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে।
- ❑ সহজাত অনাক্রম্যতা : যে সহজাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহে যে কোনো ধরনের সংক্রমণকারীকে প্রবেশে বাধা দেয় অথবা ইতোমধ্যে দেহে প্রবেশককৃত জীবাণুকে হত্যা বা ধ্বংস কওে তাকে সহজাত বা জন্মগত অনাক্রম্য ব্যবস্থা বলা হয়।
- ❑ অর্জিত অনাক্রম্যতা : মানবদেহে রোগের জীবাণু বা পরজীবী প্রবেশের পর যে অনাক্রম্যতা জেগে উঠে তাকে অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে।
- ❑ অ্যান্টিবডি : অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এবং প্রভাবে যে প্রোটিন জাতীয় বস্তু গ্রহীতার দেহে তৈরি হয় এবং নির্দিষ্টভাবে অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে আন্তঃক্রিয়া করে তাকে অ্যান্টিবডি বলে।
- ❑ ইন্টারফেরন : ইন্টারফেরন হলো উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট গ্লাইকোপ্রোটিন যা ভাইরাস আক্রান্ত কোষ কর্তৃক নিঃসৃত হয়ে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়।
- ❑ অপসোনিন : যে অ্যান্টিবডি দ্বারা কোনো অ্যান্টিজেনকে ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য সংবেদনশীল করা হয় তাকে অপসোনিন বলে।
- ❑ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি : একই মাতৃকোষ হতে সৃষ্ট অভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য অনাক্রম্য কোষ কর্তৃক নিঃসৃত অ্যান্টিবডি যা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট প্রকৃতির অ্যান্টিজেনের সাথে ক্রিয়া করে তাকে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে।
- ❑ অ্যান্টিজেন : দেহের ভেতরে যেসব পদার্থ বহিরাগত বলে চিহ্নিত হয় এবং যাদের অণুপ্রবেশের ফলে দেহ অনাক্রম্যজনিত সাড়া দেয় তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন বলে।
- ❑ টিকা : যখন কোনো অণুজীব বা অণুজীবঘটিত পদার্থ শরীরে ঢুকিয়ে অনাক্রম্যতা জাগানো হয় তখন তাকে টিকা বা ভ্যাক্সিন বলে। দেহে টিকা দেয়া মানে হলো ঐ রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করানো।
- ❑ মেমোরি কোষ : মেমোরি কোষ হলো কতগুলো বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা মানুষের অনাক্রম্যতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে। এরা মানবদেহে রোগ ও সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে দেহের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

CamScanner